পর্দা একটি বাস্তব প্রয়োজন

শামসুন্নাহার নিজামী

পর্দা
একটি বাস্তব প্রয়োজন

শামসুন্নাহার নিজামী

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ২২২

১৪শ প্রকাশ

রবিউস সানি	১৪৩৩
চৈত্র	১৪১৮
মার্চ	২০১২

বিনিময় ঃ ৩০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

PORDA AKTI BASTAB PRYOJAN by Shamsunnahar Nizami. Published by Adhunik Prokashani, 25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 30.00 Only

সূচীপত্র

* দুটি কথা ---------- ৫
* মানুষের পরিচয় ---------- ৭
* নারী এবং পুরুষের পার্থক্য ---------- ৯
* নারী পুরুষের সঠিক কর্ম বণ্টন ---------- ১২
* ইসলামী সমাজে নারী ---------- ১৮
* পর্দাহীনতার কুফল ---------- ২৭
* পর্দা একটি বাস্তব প্রয়োজন ---------- ৩২
* ইজতেহাদের নামে স্বেচ্ছাচারিতা ---------- ৫২
* উপসংহার ---------- ৫৯

দু'টি কথা

আল্লাহ পাক মানব সমাজকে সুন্দর সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে যেসব নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধান দিয়েছেন তাই ইসলাম। এর মধ্যে যেগুলো ফরয বা অবশ্য করণীয় নির্দেশ রয়েছে তা লংঘন করলে শুধু যে আখেরাতের জীবনই ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাই নয় বরং দুনিয়ার জীবনেও নেমে আসে বিপর্যয়। পর্দা এমনই একটি ফরয বা অবশ্য পালনীয় বিধান যা লংঘন করলে সমাজে অন্যায়, অশ্লিলতা, বেহায়াপনা এবং নির্লজ্জতার এতদূর প্রসার ঘটে যে, সমাজকে শেষ পর্যন্ত বিপর্যস্ত করে ফেলে। মানুষকে তখন সমাজ গঠনমূলক কাজ বাদ দিয়ে ঐ সমস্যা সমাধানের দিকে নিজেদের শক্তি মেধা ব্যয় করতে হয়। অথচ মানুষের জীবনের মেয়াদ সীমিত। এ সীমিত হায়াতে মানুষ কিছু গঠনমূলক কাজ করবে এটাই তো আশা করা উচিত।

বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, বিবাহ বিচ্ছেদ, হত্যা ইত্যাদি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কর্মক্ষেত্র বা গৃহকোণ কোথাও নারী নিরাপত্তা পাচ্ছে না। এগুলো প্রতিরোধের জন্যে গড়ে উঠছে বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন। পালিত হচ্ছে নারী বর্ষ, নারী দশক ইত্যাদি। প্রণীত হচ্ছে বিভিন্ন কর্মসূচী। কিন্তু বাস্তবে কি নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে ? নারী নির্যাতন কি কমছে ? মোটেও না। অথচ আমরা দেখতে পাই সমাজে নারীরা ব্যবহৃত হচ্ছে বিজ্ঞাপনের সামগ্রী হিসেবে। কামনীয়, লোভনীয় রূপে নারীকে ব্যবহার করা হচ্ছে স্বার্থান্বেষী মানুষের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্যে। নারী কি এতই ছোট ? সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ হিসেবে দুনিয়াতে শুধু ভোগ্য পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া ছাড়া তার কি আর কিছু করণীয় নেই ? আসলে নারীর প্রকৃত মর্যাদা তথা মানুষের মর্যাদা জানা না থাকার কারণেই এটা হচ্ছে। আর এর জন্যে শুধু নারীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তা নয় বরং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গোটা মানব সমাজ। অথচ এর থেকে বাঁচার জন্যেই আল্লাহ মানব সমাজের জন্যে অত্যন্ত বাস্তবসম্মত নির্দেশ এই পর্দার বিধান দিয়েছেন। আমাদের সমাজে দারুণ বিভ্রান্তি রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন পর্দা মানে ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে মেয়েদেরকে আটকে রাখা। বাইরে গেলেই বেপর্দা হয়ে গেল। আবার অনেকে পর্দা শুধুমাত্র মেয়েদের জন্যেই প্রয়োজন মনে করেন। তারা মনে করেন পুরুষ এ আওতার বাইরে। অথচ

ইসলামী শরীয়তে পর্দার যে বিধান দেয়া হয়েছে তা যেমন বাস্তবসম্মত তেমনই সুন্দর সমাজ গঠনের উপযোগী। এ বিধান নারীদেরকে যেমন একদিকে চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে না বা বোরখার নামে চলন্ত তাবুতে (?) পরিণত করে না। তেমনই রূপ সৌন্দর্য প্রদর্শনীরও সুযোগ দেয় না। আবার পুরুষকেও এ পর্দা প্রথার আওতামুক্ত রাখা হয়নি। তাদের জন্যেও সীমারেখা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।

বস্তুত পর্দা প্রথা সম্পর্কে সঠিক এবং সুষ্ঠু জ্ঞানের অভাবেই আজ আমাদের এই বিভ্রান্তি। অথচ আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, এই বিভ্রান্তি দূর করে যদি তারা সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারেন তাহলে শুধু পরকালীন কল্যাণ লাভের জন্যেই নয় বরং ইহকালীন জীবনের কল্যাণ, মঙ্গল ও উন্নতির জন্যে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবাই শরীয়তের এ বিধানকে স্বাগত জানাবেন।

এ আশা নিয়েই আমি এ বই লেখার কাজ শুরু করেছি। এখানে আমি নিজের কথার চেয়ে কুরআন এবং হাদীসের উল্লেখ বেশী করেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন মনীষীদের মতামতও উল্লেখ করেছি। এরপরও যদি কারও কোন আপত্তি বা পরামর্শ থাকে তাহলে আমাকে জানালে আমি কৃতজ্ঞ হব এবং সাদরে তা গ্রহণ করব। মূলত শুধু বই লেখার জন্যে এ বই লেখা নয় বরং মানব সমাজের উন্নতি কল্পেই এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আল্লাহ আমার এ প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমিন !

❐

মানুষের পরিচয়

বিরাট বিশাল এ পৃথিবী শুধু মানুষের আবাসস্থল নয়। এখানে রয়েছে হাজার রকমের বিচিত্র সৃষ্টি। খসড়াভাবে এগুলোকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। (১) জড় ও (২) অজড়। গাছপালাগুলো জড় জীবের মধ্যে এবং মানুষ, পশু, পাখী ইত্যাদি অজড় গ্রুপের মধ্যে পড়ে। এখন মানুষ এবং পশুর মধ্যে কি কি মিল এবং কোথায় অমিল রয়েছে তা আমরা আলোচনা করব।

শারীরিক গঠন প্রক্রিয়ায় মানুষ এবং পশুর মধ্যে যথেষ্ট সামঞ্জস্য রয়েছে। মানুষ যেমন খায়, হজম করে এবং তার নির্দিষ্ট পরিপাক যন্ত্র রয়েছে পশুরও তেমনি রয়েছে। সেও খায় এবং হজম করে। Heart, Lung, Kidny, Vain ইত্যাদি যেমন মানুষের আছে তেমনি রয়েছে পশুরও। চোখ, কান, নাক ইত্যাদির বেলায়ও একথা একইভাবে প্রযোজ্য ; আবার উভয়ই Manal Group-এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আমরা বলতে পারি Physically মানুষ এবং পশু Same না হলেও Similar ।

উপরের আলোচনা থেকে আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মানুষ এবং পশু একই Group-এর এবং বাহ্যত আকার-আকৃতি Metabolic activity, Movement, Locomotien ইত্যাদিতে মিল রয়েছে। তাহলে প্রশ্ন এসে যায়—মানুষ শ্রেষ্ঠ কেন ? কিসের বলে বলীয়ান হয়ে সে পশুর উপর প্রভুত্ব করবে ? উত্তরটা মানুষ শব্দের মধ্যেই রয়েছে। মানুষের মধ্যে রয়েছে মনুষ্যত্ব আর পশুর মধ্যে রয়েছে পশুত্ব। কিন্তু পশুর মধ্যে মনুষ্যত্ব নেই। এখানেই তফাৎ। আর এর ফলেই মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা। অতএব বলা যেতে পারে, মানুষের মধ্যে রয়েছে দ্বিবিধ সত্ত্বা।

(১) Animality (পশুত্ব) (২) Rationality (মনুষ্যত্ব)

মানুষের মধ্যে Animality বা পশুত্ব রয়েছে এবং তা সীমাহীনভাবেই রয়েছে। যদি মানুষের মনুষ্যত্বতা পশুত্বকে Control করতে ব্যর্থ হয় অথবা অন্য কথায় Animality Dominant হয় তবে মানুষ মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যৌন ক্ষুধা মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম। পশুরও এ চাহিদা রয়েছে। পশুর এ চাহিদা Seasonal। কখনও বা Seasonal না হলেও অতটা সীমাহীন নয়। কিন্তু মানুষ যদি মনুষ্যত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে অবাধ যৌন বিহার করতে চায়

তবে তা আর সীমার মধ্যে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। যার কবল থেকে নিষ্পাপ শিশুও রক্ষা পায় না। বর্তমান সমাজ চিত্র এর একটি জ্বলন্ত উদাহরণ।

অনুরূপভাবে একটি হিংস্র পশু কারও ক্ষতি করতে চাইলেও সে তার সীমার বাইরে, ক্ষমতার বাইরে যেতে পারে না। অথচ একটা মানুষ যেমন হাজার হাজার পশুকে খাঁচায় আবদ্ধ করে খেলা দেখাতে পারে বা আয়ত্বে রাখতে পারে তেমনি হাজার হাজার পশু যে ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে, একটা মানুষ তার চেয়ে আরও অনেক বেশী ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে। যেমন বর্তমান সভ্য সমাজে আমরা দেখতে পাই শান্ত মাথায় মানুষ হত্যার পরিকল্পনাকারীদেরকে। মুষ্টিমেয় মানুষের লালসার ইন্ধন যোগাতে প্রাণ দিচ্ছে লক্ষ লক্ষ নিরীহ জনতা। এসবই পশুত্বকে কন্ট্রোল করতে না পারার পরিণাম ফল।

এ সম্পর্কে কালামে পাকে সূরা আত-তীনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অত্যন্ত সুন্দরভাবে বলেছেন ঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ○ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ○

"আমি মানুষকে অত্যন্ত সুন্দর কাঠামো দিয়ে তৈরী করেছি পরে তাদেরকে পুরো উল্টো দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি।" (সূরা আত-তীন ঃ ৪-৫)

অর্থাৎ আল্লাহর সুন্দর সৃষ্টি মানুষ যখন মনুষ্যত্ব বিবর্জিত হয়ে যায় তখন সে পশু বা তার থেকেও নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হয়। শুধু তারাই পশুত্বকে জয় করে আশরাফুল মাখলুকাতে পরিণত হতে পারে যাদের রয়েছে ঈমান এবং সে অনুযায়ী কাজ করার যোগ্যতা।

মানুষকে সৃষ্টির সেরা বা আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদা আল্লাহ এমনিতে দেননি। প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, অপরের প্রতি সহানুভূতি এগুলো মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। পরিবেশ, পরিস্থিতি, শিক্ষা প্রভৃতির প্রভাবে মানুষ এই সহজাত প্রবৃত্তিগুলোকে হারিয়ে ফেলে। তখন সে হয়ে উঠে হিংস্র, নিষ্ঠুর, স্বার্থপর ইত্যাদি। এই সহজাত প্রবৃত্তিগুলোর বিকাশ এবং উৎকর্ষ সাধনের জন্যেই যুগে যুগে নবী-রসূল এসেছেন। যারা তাঁদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং তাঁদের দেখানো পথে চলেছেন তারা বাস্তবিকই এ দুনিয়ার সব সৃষ্টির উপর প্রাধান্য লাভের যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছেন। ফলে দুনিয়াতে এসেছে শান্তি এবং কল্যাণ। আর যারা এর বিপরীত পথে চলেছে তাদের কর্তৃত্ব দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে তারা নিজেরাও অশান্তির শিকার হয়েছে, বিশ্বেও শান্তি স্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে।

নারী এবং পুরুষের পার্থক্য

মানুষের পরিচয় জানার পর মানব জাতির দু'টি শাখা নারী এবং পুরুষ সম্পর্কে আমাদের সঠিক এবং সম্যক উপলব্ধি থাকতে হবে। সম্যক উপলব্ধি এজন্য বলছি যে, পুরুষ এবং নারী সমাজের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সামাজিক এবং সামষ্টিক জীবনের সুষ্ঠুতা এবং উন্নতি একান্তভাবে নির্ভর করে এদের সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর।

নারী যেমন পুরুষ হতে পারে না তেমনি পুরুষও কখনও নারী হতে পারে না। উভয়ের রয়েছে পরস্পর বিরোধী দেহাবয়ব, আকার-আকৃতি, শক্তি ও যোগ্যতা। একই স্থানে, একই আবহাওয়া ও একই পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেও নারী এবং পুরুষের স্বভাব প্রকৃতি মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে পার্থক্য এতবেশী, যত না পার্থক্য দুনিয়ার দু' প্রান্তে বসবাসকারী পুরুষের মধ্যে। কারণ সেক্স বা লিঙ্গের পার্থক্য অত্যন্ত মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য। শিক্ষা, পরিবেশ ইত্যাদি দ্বারা এই পার্থক্য অতিক্রম করা কখনো সম্ভব নয়। মানব সত্তায় জন্মগতভাবে যে গুণাবলী এবং যোগ্যতা রয়েছে মানুষ কেবল তারই লালন ও বিকাশ সাধন করতে পারে। যে শক্তি আসলেই তার মধ্যে নেই তার উন্নতি বা বিকাশ সাধনের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। নারী বা পুরুষ প্রশিক্ষণ ও চেষ্টা-সাধনার সাহায্যে আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ও যোগ্যতার প্রবৃদ্ধি সাধন করতে পারে। নতুন কোন যোগ্যতা সৃষ্টি করার সাধ্য কারো নেই।

বিখ্যাত ফরাসী চিন্তাবিদ আলেকসিম ক্যারেল তার বই "Man the Unknown"-এ লিখেছেন ঃ "পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে পার্থক্য তা মৌলিক পর্যায়ের। তাদের দেহের শিরা উপশিরা, স্নায়ু সবকিছু ভিন্নরূপ বলেই তাদের এই পার্থক্য বিদ্যমান। নারীর ডিম্বকোষ থেকে যে রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত হয় তার প্রভাব নারী দেহের প্রতিটি অংগে প্রতিফলিত হয়। নারী ও পুরুষের স্বভাবগত ও মনস্তাত্ত্বিক বিভিন্নতার কারণও একই।

উনবিংশ শতকের বিশ্বকোষে লিখিত হয়েছিল ঃ "পুরুষ ও নারীর যৌন অংগের আকৃতি পার্থক্যের যদিও খুব একটা বড় পার্থক্য বলে মনে হয় কিন্তু এদের মধ্যে পার্থক্য কেবল এই দিক দিয়েই নয়। নারীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত সব ক'টি অংগ-প্রত্যঙ্গ পুরুষ থেকে ভিন্ন, যেসব অংগ বাহ্যত পুরুষের মত মনে হয় তাও।"

উপরের আলোচনা থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি, নারী এবং পুরুষের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যের কারণেই প্রত্যেকে স্ব স্ব যোগ্যতা এবং প্রতিভা অনুযায়ী কর্মক্ষেত্র বাছাই করে নেবে এটাই ইনসাফের দাবী। এজন্যেই প্রকৃতি নারী এবং পুরুষের মধ্যে তাদের যোগ্যতা এবং স্বভাব অনুযায়ী কর্মবন্টন করে দিয়েছে। একজন ইঞ্জিনিয়ারকে যেমন রোগীর চিকিৎসা করতে দেয়া হয় না তেমনই একজন ডাক্তারকে কোন শিল্পোকারখানার কাজে লাগানোর চিন্তা অবাস্তব। একজন ডাক্তার বড় না একজন ইঞ্জিনিয়ার বড় এ প্রশ্ন যেমন অবান্তর তেমনি সমাজে পুরুষের প্রাধান্য বেশী না নারীর এ প্রশ্নও অযৌক্তিক। এখানে যে যার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ।

নারী এবং পুরুষ মিলেই গঠিত হয় সমাজ। সমাজে এক অংশের প্রতিনিধি নারী, অন্য অংশের প্রতিনিধি হচ্ছে পুরুষ। শুধু পুরুষ যেমন একটা সমাজ গড়তে পারে না তেমনি শুধু নারীর পক্ষেও সম্ভব নয় একটা সমাজ গড়া। স্বয়ং স্রষ্টাই নারী, পুরুষকে একে অপরের পরিপূরক ও মুখাপেক্ষী বানিয়েছেন। এই মুখাপেক্ষিতা ও নির্ভরতা সামাজিক, যৌন, মনস্তাত্ত্বিক সবদিক দিয়েই। সামষ্টিক জীবনের দাবী হল একে অপরের সাথে সমান তালে চলবে। সামাজিক জীবনের সুষ্ঠুতা ও উন্নতি-অগ্রগতি একান্তভাবে নির্ভর করে নারী-পুরুষের সম্পর্ক সুষ্ঠু ও সঠিক হওয়ার উপর। আর এ সম্পর্ক যদি ভারসাম্যহীন হয় তাহলে সমাজ সর্বাত্মকভাবে ভাঙ্গন ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। সমাজকে যদি একটা গাড়ীর সাথে তুলনা করা হয় তবে এ গাড়ীর দুই চাকা নারী ও পুরুষ। দু'টোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর একটি চাকা যদি ছোট হয়— আস্তে চলে বা না চলে তবে গাড়ী কিছুতেই সামনে অগ্রসর হতে পারবে না। ফুটবল খেলোয়াড়গণ যেমন যে যার জায়গা থেকে বলকে গোলের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সচেষ্ট হয় তেমনিভাবে নারী পুরুষকে তার স্ব স্ব স্থানে থেকে সমাজকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

পুরুষ এবং নারী মানুষ হিসেবে অভিন্ন হলেও তাদের দৈহিক ও মানসিক গঠন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এর থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, প্রকৃতি তাদের থেকে পৃথক ধরনের কাজ নিতে ইচ্ছুক। একই ধরনের কাজ প্রকৃতি তার কাছ থেকে নেয়ার পক্ষপাতি নয়। এবং এই সৃষ্টি রক্ষার প্রয়োজনেই উভয়ের স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবদান রাখা একান্তই জরুরী।

আল্লাহ এই নারী এবং পুরুষ জাতি সৃষ্টি করে তাদের জন্যে জীবন চলার বিধি-বিধানও দিয়ে দিয়েছেন। এ নিয়ম লংঘন করলে মঙ্গলতো কখনই আসবে না বরং ডেকে আনবে সমূহ বিপদ। উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি Electricity-এর কথা। এতে (+ve) এবং (-ve) তার রয়েছে। এ দু'টো তার আলাদাভাবে মানুষের কাজে লাগে না। এই তার দু'টোকে কোন বিদ্যুৎ অপরিবাহী বস্তু দিয়ে আবৃত করে যদি নির্দিষ্ট

স্থানে নিয়ে এ তারের সংযোগ ঘটানো যায় তবে মানুষের যথেষ্ট কল্যাণে লাগানো সম্ভব। এই সংযোগ কোথাও আলো জ্বালায়, কোথাও পাখা ঘোরায়, কোথাও তাপ উৎপাদন করে ইত্যাদি।

এগুলো নিসন্দেহে মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় এবং উপকারী। কিন্তু নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার আগেই যদি এ দু'টো (+ve) এবং (-ve) তারকে খোলা ছেড়ে দেয়া যেত তবে পূর্বাহ্নেই কোন প্রলয় ঘটত। তখন মানবের কোন কল্যাণের পরিবর্তে সে ধ্বংস সাধনই করত। অনুরূপভাবে নারী-পুরুষের বিধিসম্মত ও পরিকল্পিত মিলন যেমন এ বিশ্বে সার্বিক কল্যাণ-মঙ্গল এনে দিতে পারে তেমনি এ দু' প্রজাতির অবাধ এবং সীমাহীন মেলামেশা সমাজকে টেনে নিয়ে যেতে পারে চরম ধ্বংসের দিকে।

পুরুষের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবেই কিছু অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটি রয়েছে যা নারীর সংগ ছাড়া পূর্ণ হবার নয়। অনুরূপভাবে নারীর ত্রুটিসমূহের সম্পূরক কেবলমাত্র পুরুষই। এ জন্যেই কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ط

"তারা হচ্ছে তোমাদের জন্যে পোশাক এবং তোমরা হচ্ছ তাদের জন্যে পোশাক।" (বাকারা ঃ ১৮৭)

পুরুষ কিংবা নারী যদি পরস্পর সহযোগিতা ছেড়ে দেয় কিংবা একদল নিজ দায়িত্ব ভুলে যায় বা অবহেলা করে তাহলেই মানবতার চরম বিপর্যয় দেখা দেয়। নর-নারী একই মানবতার দু'টি ধারা বা শাখা। তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই মানব সভ্যতা রক্ষা পেতে পারে।

যারা নারী সত্তাকে পুরুষদের থেকে পৃথক ও স্বাধীন করে দেখতে চায় তাদের তুলনা করা যায় সেই মূর্খদের সাথে যারা হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের মিলিত রূপ পানি থেকে এর যে কোন একটিকে ভিন্ন করে পেতে চায় ; অথচ পানির অস্তিত্বই নির্ভর করছে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের মিলনের উপর এবং এর একটা থেকে আর একটার বিয়োগে পানির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। পানির বেলায় যেমন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের একটাকে অপরটা থেকে ভিন্ন ও স্বাধীন করে দিয়ে পানি রাখা সম্ভব হয় না তেমনি নর ও নারীর এক শ্রেণী থেকে অপর শ্রেণীকে পৃথক করে দিয়ে মানব সভ্যতার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কথা কল্পনা করা যায় না। আবার পানিতে অক্সিজেন যেমন হাইড্রোজেনের কাজ করতে পারে না তেমনি হাইড্রোজেন পারে না অক্সিজেনের পরিপূরক হতে। অনুরূপভাবে সমাজে নর-নারী কেউই একে অপরের কাজ দখল করে নিয়ে সুষ্ঠু মানব সমাজ গড়তে পারে না।

নারী পুরুষের সঠিক কর্ম বণ্টন

বিশ্ব স্রষ্টা তাঁর সৃষ্ট জীবকে বিভিন্ন শ্রেণী ও গোত্রে বিভক্ত করে পৃথক পৃথক দায়িত্বে নিয়োজিত করেছেন। কারণ, এ বৈচিত্রময় সৃষ্টির বিভিন্নমুখী প্রয়োজন মেটানোর জন্যে একই ধরনের দৈহিক ও মানসিক শক্তি যথেষ্ট নয়। তাই যে শ্রেণীকে যে প্রয়োজনে সৃষ্টি করা হয়েছে তাকে তদুপযোগী দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতা দেয়া হয়েছে। এ তারতম্যের ভিত্তিতেই তাদের জীবনধারা ও জীবিকা পদ্ধতিতে পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রত্যেক শ্রেণীকেই ভিতরে ও বাইরে সেভাবেই গড়ে তোলা হয়েছে—যেভাবে গড়ে তুললে তারা স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়।

উদাহরণ হিসেবে প্রাণী জগতের মধ্যে উটের কথাই ধরা যাক। উটের খাদ্য হচ্ছে মরুভূমির কাঁটা জাতীয় গাছপালা। উটের জিভ ও দাঁত এই কাঁটাভরা ডালপালা ভেঙ্গে খাওয়ার উপযোগী। এছাড়া তার পাকস্থলী এবং পরিপাক যন্ত্রও এগুলো হজম করার উপযোগী করে তৈরী। এছাড়া মরুভূমিতে চলার সময় পানি পাওয়া যায় না বিধায় মরুদ্যান থেকে এক সঙ্গে অনেক পানি পান করে পাকস্থলীতে জমিয়ে রাখার বিশেষ ব্যবস্থাও তার রয়েছে যা অন্য কোন প্রাণীর নেই। মরুচারীরা উট জবাই করে সহজেই এ পানি পান করতে পারে—এতটা বিশুদ্ধ থাকে এ পানি।

বাঘ, সিংহ ইত্যাদি প্রাণীকে দেখতে পাই তাদের প্রখর দাঁত, নখ, থাবা সহ। ছাগল গরু শিকার করে খাওয়ার জন্যে এগুলো যথেষ্ট উপযোগী।

অনুরূপভাবে পাখিকে আকাশে উড়ার উপযোগী করেই সৃষ্টি করা হয়েছে। পাখির হাতগুলো ফাঁপা। পালক এবং বাইরের ও ভিতরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার উপযোগী করেই ভিন্নভাবে তৈরী করা হয়েছে। শুধু প্রাণী জগতেই নয় উদ্ভিত জগতেও আমরা দেখতে পাই মরুভূমির গাছগুলোর পাতা, শিকড় অন্যান্য অঞ্চলের গাছপালা থেকে পৃথক। মরুভূমিতে যেহেতু পানির অভাব, আবহাওয়া শুষ্ক কাজেই এ অঞ্চলের গাছগুলোর পাতাগুলো Flashy, Evaporating Surface কম Spiny ইত্যাদি। আবার শিকড়গুলো মাটির নীচে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যায় যাতে করে বহু নীচ থেকে পানি এবং প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করতে পারে। এভাবে যে এলাকায় তাকে থাকতে হবে সেই এলাকার আবহাওয়ার উপযোগী করেই এগুলো তৈরী করা হয়েছে।

প্রাকৃতিক জগতের এই Adaptation-কে সমানে রেখে আমরা অনায়াসেই একথা বলতে পারি যে, প্রকৃতি প্রত্যেককেই তার প্রয়োজন পূরণের উপযোগী করেই সৃষ্টি করেছে। পবিত্র কুরআনেও একথাই বলা হয়েছে ঃ

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً ج

" হে আমার রব! এই সবকিছু তুমি অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি কর নাই।"(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯১)

رَبُّنَا الَّذِىْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ○

"(বল) আমাদের প্রভুই তো প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করে যার যার পথ নির্দেশ করেছেন।" (সূরা ত্বাহা ঃ ৫০)

اِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ ○

"নিশ্চয়ই আমি প্রতিটি বস্তু নির্দিষ্ট পরিমাণে সৃষ্টি করেছি।"
(সূরা আল কামার ঃ ৪৯)

বিশ্বস্রষ্টার অন্যান্য সৃষ্টির মত মানবকুলও এক ভারসাম্যপূর্ণ সৃষ্টি। পুরুষ এবং নারীর আকৃতি এবং প্রকৃতিগত যে পার্থক্য তাও অর্থহীন নয় এবং উভয়কে একই জাতীয় কার্য সম্পাদনের জন্যেও সৃষ্টি করা হয়নি।

নারীকে যে মাতৃত্বের গুরু দায়িত্ব পালনের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে একথা অস্বীকার করার কোন উপায়ই নেই। আল্লাহ্ পাক নারীর উপর মানব জাতির সম্প্রসারণ, সংরক্ষণ ও প্রতিপালনের গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। এই গুরু দায়িত্ব পালনের জন্যে প্রয়োজনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতা আল্লাহ্ তাকে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে পুরুষ জাতিকে তিনি সেসব থেকে বঞ্চিত রেখেছেন। ফলে পুরুষের পক্ষে নারীর বিশেষ দায়িত্ব পালন করা একেবারে অসম্ভব। তেমনি, পুরুষকে তাদের বিশেষ দায়িত্ব পালনে উপযোগী দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতা দেয়া হয়েছে। ফলে, নারীর পক্ষেও পুরুষের কঠোর দায়িত্ব পালন করা খুবই দুরূহ ব্যাপার।

মানব জাতির সম্প্রসারণ, সংরক্ষণের যে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা নারীর জন্যে যেমন সংকটময় তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। মানব শিশুর সংরক্ষণ ও প্রতিপালনের জন্যে বিশেষ সকর্ততা ও বিধি ব্যবস্থা অপরিহার্য। এ কাজে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রদর্শন করলে মারাত্মক বিপদ ও কঠিন অসুখে আক্রান্ত হতে পারে। বিশেষ করে গর্ভধারণ থেকে শুরু করে শৈশবে স্তন্যদান এবং লালন-পালন পর্যন্ত সময়ে বিশেষ সতর্কতা

অবলম্বন করা প্রয়োজন। এমনকি মানুষের অজ্ঞতার বুনিয়াদ যেমন এ সময়কার অসাবধানতার ফলে হয় তেমনই মানব জীবনের বিভিন্নমুখী সৌন্দর্যের উৎপত্তি এই সময়ের সতর্কতামূলক ব্যবস্থারই ফলশ্রুতি।

গর্ভাবস্থা নারীর জন্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন সময়। এ সময় অনেকে ঘরকন্যার স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনেও অক্ষম থাকে। মায়ের সাধারণ কাজ-কর্মের প্রতিক্রিয়াও এ সময়ে গর্ভস্থ সন্তানের উপর পড়ে। গর্ভাবস্থায় মায়ের প্রত্যেকটি অবস্থা দ্বারা সন্তান প্রভাবিত হয়। গর্ভস্থ সন্তানের সবলতা, দুর্বলতা এমনকি বাঁচা মরার প্রশ্নও মায়ের সতর্কতার উপর নির্ভরশীল। মায়ের অসতর্কতার দরুন ভবিষ্যতে সন্তানের দৈহিক ও মানসিক বৈকল্য পরিলক্ষিত হতে পারে। বিভিন্ন শিশুর বিভিন্ন অভ্যাস, চাল-চলন, দৈহিক গঠন, শক্তির তারতম্য ইত্যাদির উপরে জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে যে, তার মূলে রয়েছে মায়ের বিভিন্ন কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়া।

একবার ফ্রান্সের এক শ্বেতকায় দম্পতির হাবশীর মত এক কৃষ্ণকায় সন্তান জন্ম নেয়। এতে ডাক্তারগণ অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। পরে বিশেষ অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেল যে, গর্ভাবস্থায় সেই ভদ্র মহিলা যে টেবিলে সাধারণত বসতেন তাতে এক হাবশী ভৃত্যের প্রতিমূর্তি রয়েছে। যার প্রভাব তার মগজে প্রতিফলিত হওয়ার ফলে গর্ভস্থ সন্তানের উপর পিতামাতার শ্বেত বর্ণের চাইতে সেই প্রতিমূর্তির কৃষ্ণ বর্ণের প্রভাবই অধিক প্রতিফলিত হয়েছে। কাজেই এ সময়ে মায়ের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

এরপর আসে প্রসবের সময়। এটা নারীর জীবনে এক জটিলতম সময়। এ সময়ে বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য। এ সময়ে সামান্য অসতর্কতা বা অবহেলা শিশুকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে।

স্তন্যদানের সময় কালটিও কম গুরুত্বের দাবী রাখে না। এ সময়ে মাতাকে আহারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। মাতা যদি কোন রকম কুপত্য গ্রহণ করেন তবে তার প্রভাব সরাসরি সন্তানের মধ্যে দুধের মাধ্যমে প্রবেশ করে। মাতার আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদির উপর সন্তানের দৈহিক সৌষ্ঠব ও মানসিক উৎকর্ষ সাধন নির্ভর করে।

স্তন্যদানের পর প্রতিপালন কালও কম গুরুত্বের দাবী রাখে না। বরং প্রতিপালনের সময়ের গুরুত্ব পূর্বের অধ্যায়ের চেয়ে অনেক বেশী মানব জীবনে সর্বাঙ্গীন সৌন্দর্যের ভবিষ্যত এ সময়টার উপর নির্ভরশীল।

এক অদৃশ্য জগত থেকে মানব শিশু হঠাৎ এই দুনিয়াতে পদার্পণ করে। তখন সে থাকে একখণ্ড স্বচ্ছ আয়নার মতই। কোন দাগ বা কালিমা তাতে থাকে না। সে তখন পারিপার্শ্বিকতা থেকে গ্রহণ করার জন্যে থাকে উন্মুখ। এ সময়ে যে ছবি তাতে বিম্বিত হবে তা আজীবন অংকিত থাকবে। যদি কোন সর্বাঙ্গীন সুন্দর নকশা তাতে অংকিত হয় তবে তা চিরতরে সুন্দর হবে। পক্ষান্তরে দুর্ভাগ্যবশত যদি কোন অজ্ঞ কারিগর হিজিবিজি এঁকে সেটাকে বিশ্রী করে তোলে তাহলে স্থায়ীভাবেই সেটা বিশ্রী হয়ে যাবে। কারণ, শূন্য স্বচ্ছ জায়গায় প্রথমে যা আসবে তাই চিরস্থায়ী হবে এবং তারই ভিত্তিতে গড়ে উঠবে তার ভবিষ্যত। বলা বাহুল্য, এই দুর্লভ মুহূর্তে স্নেহময়ী মাতার হাতেই এই স্বচ্ছ আয়নায় চিত্রাংকনের দায়িত্ব থাকে। যদি মাতৃজাতি এই সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ব্যর্থ হন কিংবা তার অপব্যবহার করেন তবে ভবিষ্যত মানব গোষ্ঠী মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কাজেই মায়ের কাজ হয় এই মহার্ঘ্য মুহূর্তে শিশুর স্বচ্ছ দর্পণে চারিত্রিক সৌন্দর্য সৃষ্টির সহায়ক গুণাবলী অংকিত করে দেয়া। অন্যথায় যদি কোন খারাপ গুণাবলী সৃষ্টি হয় তবে শুধু শিশুই নয় গোটা মানবজাতিরই ভবিষ্যত দুর্বিসহ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। কারণ, এ সময়কার অংকিত প্রভাব মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিতে পরিণত হয়। আজীবন সাধনা করেও তা থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হয় না। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মহৎ ব্যক্তিবর্গের জীবনের উন্নতির মূলে রয়েছে এ সময়কার শিক্ষা। এবং এটা সর্বতোভাবেই মাতৃজাতির হাতেই ন্যস্ত থাকে।

যে মাতৃজাতির স্বাভাবিক এবং প্রকৃতি প্রদত্ত দায়িত্ব এতো গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল তারা কি করে বাইরের জগতের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক টানা হেঁচড়ায় অংশ নিবে? বহির্জগতে এই সমস্ত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে গেলে কি করে তারা নিজ দায়িত্ব সঠিক রূপে পালন করবে?

মনে করা যাক, কোন নারী শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-গরিমায় চরম উন্নতি লাভ করে কোন দেশের আইন সভার সদস্যা বা কোন বিখ্যাত রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব লাভ করল। কিন্তু স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী তাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হল। এই দাম্পত্য বন্ধনের ফলে সে হয়ত গর্ভবতী হয়ে পড়ল। তখন এই মহিলা কি অবস্থায় পড়বে? যদি সেই সময় এমন কোন রাজনৈতিক ইস্যু ময়দানে বর্তমান থাকে যার দাবী হল শারিরীক এবং মানসিক সর্বশক্তি নিয়োগ করা, তখন তিনি কি করবেন? একদিকে সর্বমুহূর্তে দলীয় সফলতার প্রশ্ন অন্যদিকে তখন তার সতর্কভাবে স্বাস্থ্যবিধি ও অন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থাদি অনুসরণের অপরিহার্যতা, কোন্ দিক সে রক্ষা করবে? অথচ

এই সময়ের বিন্দুমাত্র অসতর্কতাও একাধারে তার নিজের ও গর্ভজাত শিশুর অনিবার্য ধ্বংস ডেকে আনতে পারে।

এরূপ পরিস্থিতে নারীর স্বাভাবিক দায়িত্ব তার মাতৃত্ব রক্ষা করা— নেতৃত্ব রক্ষা করা নয়। কারণ, তার নিজের ও ভাবী বংশধরের দৈহিক ও মানসিক কল্যাণের জন্যে বর্তমানের এই নেতৃত্বের মোহ তাকে ছাড়তে হবে। এছাড়া রাজনৈতিক তিক্ত পরিবেশের প্রভাব কিছুতেই গর্ভস্থ সন্তানের জন্যে কল্যাণকর হবে না।

অথবা ধরা যাক একজন দক্ষ মহিলা ব্যারিষ্টারের কথা। হয়ত তার কোলে সদ্যজাত কচি একটি শিশু। মায়ের কাছে সে চায় তার আইনগত প্রাপ্য স্নেহ মমতা ও সযত্ন সেবা। এ ক্ষেত্রে যদি মাকে আগামী দিনের মামলা ও মোয়াক্কেলের সাফল্য ভাবনায় রাতদিন চব্বিশ ঘন্টা তাকে বড় আইনের বই, নথিপত্র ও সলা পরামর্শে ব্যস্ত থাকতে হয়, তবে কি তার পক্ষে সেই স্নেহাতুর সন্তানের ব্যাকুল মূক আবেদনে সাড়া দিয়ে মাতৃত্বের মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভবপর ? যদি মাতৃত্ব রক্ষা করতে হয় তবে কি তার পক্ষে মোয়াক্কেলের মামলা জয়ের কিংবা মুক্তি লাভের জন্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আইনের ধারা নিয়ে গবেষণা চালানো সম্ভবপর হবে ? আসলে এ ধরনের বড় দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে দিনরাত বিরাট বিরাট আইনের বই চষে বেড়াতে হলে তার কাছ থেকে ভবিষ্যত মানব গোষ্ঠীর সংরক্ষণ ও প্রতিপালনের আশা করা অবান্তর।

মায়ের স্বাভাবিক দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানের জন্ম থেকে শুরু করে লালন-পালনের দায়িত্ব মুক্তির শেষ দিন পর্যন্ত তাদের আহার, নিদ্রা, চলা-ফেরা, আচার-আচরণের প্রতি সজাগ সতর্ক দৃষ্টি রাখা। সন্তানের স্বর্ণোজ্জল ভবিষ্যত গড়ে তোলার এ মোক্ষম সময়কে কাজে লাগান। এ সময়ে প্রকৃত শিক্ষিত মা-ই পারেন তার সন্তানের মধ্যে প্রকৃত সৎ গুণাবলীর সমাবেশ ঘটাতে এবং খারাপ দোষ মুক্ত রাখতে। পক্ষান্তরে এ সময়ে যদি মা ব্যারিষ্টার সেজে মোয়াক্কেলের পক্ষে জজের এজলাসে দাঁড়িয়ে বিপক্ষকে হারানোর চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকেন অথবা আইন পরিষদের সদস্য সেজে অথবা কোন পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করে নিজ নিজ পার্টির সাফল্য কামনায় চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন তখন অসহায় শিশুটি মাতৃস্তন্যের বিকল্প কৃত্রিম দুধ ভর্তি ফিডার অশিক্ষিত আয়ার হাতে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট থাকে, আর সেই আয়ার চরিত্রের এবং কার্যকলাপের দৃশ্যটিও চিরস্থায়ীভাবে অঙ্কিত হয় তার মনের আয়নায়। উত্তম শিক্ষা-দীক্ষার কিছুই তার ভাগ্যে জোটে না। এছাড়া রাজনৈতিক দাবা খেলায় হেরে যেয়ে যখন সে

দুর্ভাবনাগ্রস্ত থাকবে তখনই বা তার অসহায় সন্তানটি তার কাছে পাওয়ার আর কি থাকবে ?

নারীর স্বাভাবিক এবং প্রকৃতিগত কর্তব্যই এ রকম যে, তারা যদি পুরুষের কর্মক্ষেত্রে আসে তবে সে মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম করতে বাধ্য হয় অথচ নিজের দায়িত্বের হকও সে আদায় করতে পারে না। দেখা যায় স্বামী স্ত্রী দু'জনেই হয়ত ডাক্তার। বাইরের কর্মক্ষেত্রে উভয়ের দায়িত্ব সমান। কিন্তু সন্তানের স্কুলে আনা নেয়া, যাবতীয় তত্ত্বাবধান স্ত্রীকেই করতে হয়। তদুপরি, বাসায় ফিরে সেই স্বামীর যাবতীয় খেদমত তার স্ত্রীকেই করতে হয়। গৃহস্থালীর কোন কাজেই সে তার স্ত্রীকে সাহায্য করার দরকার মনে করে না। বরং তখন তার বিশ্রামের প্রয়োজন হয়।

প্রাকৃতিক নিয়মেই মানব জাতির দু' শ্রেণীর কাজ দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে। পুরুষ নারীকে পৃথক ক্ষেত্রে আটকে রাখেনি বরং প্রকৃতিগত দায়িত্বই তাকে বাধ্য করেছে। বিশেষ ক্ষেত্রে কাজ করার জন্যে প্রকৃতি নারীকে যে প্রয়োজনে গড়েছে সে ক্ষেত্রে পুরুষের আদৌ প্রবেশ সম্ভব নয়। ফলে যখনই সে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখন মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম করতে বাধ্য হয়। কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে সে ক্ষেত্রে নারী সাফল্য অর্জন করলেও মানব সমাজে দেখা দেয় চরম বিপর্যয় ও ভাঙন। ভবিষ্যত বংশধরগণ আদর্শহীন, নীতিহীন হয়ে অন্ধকারে হাতড়ে মরে। বর্তমানে সমাজে আধুনিক উচ্চ শিক্ষিত পিতা-মাতার সন্তানকে যখন আমরা দেখি অসৎ চরিত্রের নীতিজ্ঞানহীন মূর্খের মত আচার-আচরণ করতে তখন আমরা তথাকথিত নারী মুক্তি বা নারী স্বাধীনতার ফল হাড়ে হাড়ে অনুভব করি।

মূলত নারী মুক্তি আন্দোলন বা নারী স্বাধীনতার শ্লোগান সবই স্বার্থান্বেসী পুরুষের আবিষ্কার। এ শ্লোগান নারীকে অধিক মাত্রায় ব্যবহার করার হীন প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

❐

ইসলামী সমাজে নারী

আগের আলোচনায় যদিও আমরা দেখেছি যে, প্রকৃতি নারীকে ঘরের কাজের উপযোগী করে তৈরী করেছে কিন্তু তাই বলে তাকে কেবল ঘরের মধ্যেই বন্দী হয়ে থাকতে হবে এমন নয়। প্রয়োজনের মুহূর্তেও সে ঘরের বাইরে বের হতে পারবে না, এমন কথা ইসলামী সমাজ বিধানে বলা হয়নি। বরং সমাজের সার্বিক কল্যাণ এবং মঙ্গলের জন্যে প্রয়োজনে শুধু বাইরে আসার অনুমতিই নয় বরং নির্দেশও রয়েছে। দ্বীনের মৌলিক দায়িত্ব পালনের জন্যে পুরুষের যতটা দায়িত্ব নারীরও ঠিক ততটা দায়িত্ব। সূরা আলে ইমরানের শেষ রুকূ'তে আল্লাহ পাক মানুষের এ দুনিয়ার দায়িত্ব সার্বিকভাবে পালনকারীদের সফলতা এবং অমান্যকারীদের ব্যর্থতার বর্ণনা দিয়েছেন এবং দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে নারী এবং পুরুষ উভয়কে সমভাবে দায়িত্বশীল বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন ঃ

أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ○

"আমি তোমাদের মধ্যে কারও কাজকে বিনষ্ট করে দেব না। পুরুষ হোক কি স্ত্রী তোমরা সবাই সমজাতের লোক। কাজেই যারা একমাত্র আমারই জন্য নিজেদের জন্মভূমি পরিত্যাগ করেছে, আমারই পথে নিজেদের ঘর-বাড়ী থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে ও নির্যাতিত হয়েছে এবং আমারই জন্য লড়াই করেছে ও নিহত হয়েছে তাদের সব অপরাধই আমি মাফ করে দেব এবং তাদেরকে এমন বাগিচায় স্থান দেব যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে। আল্লাহর নিকট এটাই তাদের প্রতিফল। আর উত্তম প্রতিফল একমাত্র আল্লাহর কাছেই পাওয়া যেতে পারে।"

(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯৫)

কোন নারী ইসলামী সমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে চাইলে তাকে কতকগুলো বিষয় স্পষ্ট ভাষায় অংগীকার করতে হবে।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ

يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

"হে নবী! মু'মিন স্ত্রীলোকেরা যখন তোমার নিকট বায়আত গ্রহণের জন্যে আসে এসব বিষয়ে যে, তারা আল্লাহর সংগে একবিন্দু শিরক করবে না, যেনা করবে না, তাদের সন্তান হত্যা করবে না, জেনে-শুনে কারুর উপর মিথ্যা দোষারোপ করবে না, ভাল কাজে তোমার আনুগত্য করবে, তখন তুমি তাদের বায়আত গ্রহণ কর এবং তাদের জন্যে আল্লাহর নিকট মাগফেরাত চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।"

(সূরা মুমতাহিনা ঃ ১২)

এ আয়াতে দ্বীনের কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে শপথ নেয়ার জন্যে রাসূল করীম (সা)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ দায়িত্ব পুরুষের যতটা নারীর তার থেকে কিছু কম নয়। জীবনে চলার পথে দায়িত্ব কর্তব্য কি তা যেমন পুরুষের জানতে হবে নারীকেও তা জানতে হবে। এ আয়াত কোন ভাল এবং মঙ্গলজনক কাজে রাসূল (সা)-এর আনুগত্যের শপথের মাধ্যমে মানুষকে সামাজিক ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল বানিয়ে দেয়। যার ফলে নারী সমাজকে দ্বীনের সংরক্ষক ও দ্বীনী সমাজ স্থাপনের কাজে সংগ্রামী করে তোলে। রাসূলে করীমের (সা) সময়েই এর বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছিল। সে সময়ে দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক জ্ঞান লাভের জন্যে নারীরা অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছিল। হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ

"মেয়েরা দ্বীন সম্পর্কিত জ্ঞান লাভের জন্যে এতই তৎপর হয়ে উঠেছিল যে, এ পথে তারা কোনরূপ লাজ-লজ্জারও পরোয়া করত না।"(মুসলিম)

হযরত আয়েশা (রা) আরও বলেছেন ঃ

"নবী করীম (সা)-এর সময়ে কোন আয়াত নাযিল হলে তাতে বর্ণিত হালাল-হারাম ও আদেশ-নিষেধসমূহ সঙ্গে সঙ্গেই আমরা আয়ত্ব করে নিতাম, কেবল তার শব্দ মুখস্ত করে ক্ষান্ত হতাম না।"

(আল ইকদুল ফরীদ)

জুময়া ও ঈদের নামাযে শরীক হওয়ার জন্যে ঘরের বাইরে যাওয়া মেয়েদের জন্যে ফরয করা হয়নি একথা ঠিক কিন্তু তাতে যে গুরুত্বপূর্ণ এবং জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেয়া হয় তা শোনা ও তার থেকে উপকৃত হওয়ার জন্যে সুযোগ গ্রহণ নারীদের কর্তব্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। (বুখারী)

রাসূলে করীমের (সা) সময়ে যে জ্ঞান চর্চার মজলিস অনুষ্ঠিত হত মহিলারা পর্দার আড়ালে থেকে তা শুনতেন। তারা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সমাবেশে উপস্থিত হতেন চিত্তবিনোদনের জন্যে নয় বরং ইসলাম সম্পর্কে

নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যেই। রাসূল (সা)-ও মহিলাদের দ্বীন ইসলাম শিক্ষা লাভের জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। কোন সময় যদি তিনি মনে করতেন যে, মহিলারা কথা ঠিকমত শুনতে পারেনি তাহলে একবার বলা কথা মহিলাদের কাছে যেয়ে পুনরাবৃত্তি করতেন। রাসূল (সা) উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, আদর্শ সমাজ গড়ে তুলতে হলে পুরুষের ন্যায় নারীদেরকেও দ্বীন সম্পর্কে সুশিক্ষিতা করে তুলতে হবে এবং সমাজ প্রধান হিসেবে এ দায়িত্ব তার নিজের। তাই সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা মহিলাদের জন্য যথেষ্ট না মনে হলে অনেক সময় স্বতন্ত্র ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। একবার মহিলারা রাসূল (সা)-এর কাছে দাবী জানালেন ও অভিযোগ করলেন ঃ "আপনার দরবারে সবসময় কেবল পুরুষদের ভীড় জমে থাকে। আমরা আপনার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের কোন সুযোগ পাই না। কাজেই আমাদের শিক্ষাদানের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।" তিনি তাদের দাবী মেনে নিলেন। মদীনায় আনছার গোত্রের একটি ঘরে মহিলাদের একত্রিত করে তাদের দ্বীন শিক্ষাদানের জন্যে হযরত উমর ফারুক (রা)-কে পাঠিয়েছিলেন। তিনি ঘরের বাইরে থেকে মহিলাদের লক্ষ করে ভাষণ দিয়েছিলেন।

মহিলাদের জন্যে বস্তুগত ও দ্বীনি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা থাকলেও তাদেরকে এমন খারাপ পরিবেশে ঠেলে দেয়া যাবে না যেখানে নীতি নৈতিকতা বা শালীনতা রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

প্রত্যেক মানুষের জন্যে ঘরই হচ্ছে তার প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রে শিক্ষাদানের দায়িত্ব মূলত পিতা-মাতা বা স্বামীর উপর। এ ব্যাপারে রাসূলে করীম (সা)-এর নির্দেশ হল ঃ

> "তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গের নিকট যাও। তাদের মধ্যে বসবাস কর, তাদের জ্ঞান শিক্ষা দাও এবং সেই অনুযায়ী আমল করার জন্যে তাদের আদেশ কর।" (বুখারী)

ইসলামী সমাজে মহিলাদের জ্ঞানার্জন অত্যন্ত জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্যেই নিজ নিজ ঘরের মহিলাদের দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্যে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশ কেবলমাত্র দ্বীনি বিষয়েই নয় বরং বিভিন্ন কারিগরী শিক্ষাও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। যদি কোন নারী তার পারিবারিক পরিবেশে এ জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম না হয় তবে তাকে প্রয়োজনে বাইরে যেতে হবে। এ ব্যাপারে ইসলামী সমাজকে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে। শুধু কিতাবী জ্ঞানই নয় বরং তাদের চিন্তা শক্তির উৎকর্ষ সাধন এবং অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন সত্য ও তত্ত্ব উদঘাটনের জন্যে নারীর মানসিক শক্তির বিকাশ সাধনের ব্যবস্থা করাও

ইসলামী সমাজের কর্তব্য। কেননা, শুধু চিন্তা-গবেষণা বা জ্ঞানার্জনই নয় বরং বাস্তব কর্মক্ষেত্রে যথার্থ ভূমিকাও নারীকে পালন করতে হবে।

ইসলামী সমাজে নারী যেমন জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করবে তেমনি প্রয়োজনে কৃষি, ব্যবসায়, শিল্পকারখানা স্থাপনের কাজেও সে অংশগ্রহণ করতে পারে। সমাজ এবং জাতির খেদমতের কাজেও সে অংশগ্রহণ করতে পারে। রাসূল (সা)-এর যুগের মহিলারা বিভিন্নভাবে বাইরের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতেন। রাসূল (সা) একবার জিহাদে গমনকারী লোকদের সামুদ্রিক সফর করার বিরাট সওয়াব ও মর্যাদার কথা বর্ণনা করলে উম্মে হারাম নামের এক মহিলা সাহাবী বললেন ঃ "ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) দোয়া করুন, আমিও যেন এই জিহাদে শরীক হতে পারি।" রাসূল (সা) তার জন্যে দোয়া করলেন।

আসলে ইসলাম একটি স্বভাবসম্মত বাস্তব জীবন বিধান। জীবনের সমস্ত কাজ-কর্মকে সুন্দর ও সুচারুরূপে পরিচালনা করাই এর উদ্দেশ্য। তাই ইসলামী সমাজে নারীদের বাইরের জগতের কাজ-কর্মকে নিষেধ না করে অনুমতি দিলেও পছন্দ করা হয়নি এ কারণে যে, নারীদের স্বাভাবিক যে দায়-দায়িত্ব অর্থাৎ গর্ভধারণ, প্রসব, সন্তান লালন-পালন ইত্যাদির দায়-দায়িত্ব পালন করার পর (যা কোনক্রমেই আর কাউকে দিয়ে করানো যায় না।) বাইরের জীবনের কঠিন কঠোর দায়িত্ব পালন করা তাদের উপর যুলুম হয়ে যায়।

কিন্তু মহিলারা যে বাইরে কখনো বের হবে না, কোন দরকারী কাজও করবে না এমন নয়। রাসূল (সা)-এর সময়ে একজন মহিলা সাহাবী তালাকপ্রাপ্তা হয়ে ইদ্দত পালনকালে ঘরের বাইরে গিয়ে নিজের বাগানে খেজুর গাছের ডাল কেটে বিক্রয় করার অনুমতি চাইলে রাসূলে করীম (সা) জবাবে বললেন ঃ

اُخْرُجِىْ فَجُدِىْ نَخْلَكِ اَنْ تَصَدَّقِىْ مِنْهُ اَوْ تَفْعَلِىْ خَيْرًا - اِنَّهُ اُذِنَ لَكُنَّ اَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ-

"ক্ষেত্রে যাও, অতপর নিজের খেজুর গাছের ডাল কাট (আর বিক্রয় কর)। এই টাকা দ্বারা সম্ভবত তুমি দান-খয়রাত অথবা অন্য কোন ভাল কাজ করতে পারবে। (এভাবে তা তোমার পরকালীন কল্যাণ লাভের মাধ্যম হবে।"(আবু দাউদ)

একথা বলে নবী করীম (সা) হযরত হাবীব (রা)-এর খালাম্মাকে মানবতার কল্যাণমূলক কাজ করার জন্যে উৎসাহিত করলেন। কিন্তু বাইরে যেতে গিয়ে কখনোই যেন সীমা লংঘিত না হয় সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলিম মহিলারা প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতেন। এ ব্যাপারে বিশেষ কোন বিধি-নিষেধ ছিল না। কিন্তু পর্দার বিধান নাজিল হওয়ার পর হযরত ওমর (রা) হযরত সওদাকে (রা) বাইরে দেখতে পেয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। হযরত সওদা (রা) এ ব্যাপারটি নবী করীম (সা)-এর নিকট প্রকাশ করেন। কিছুক্ষণ পরই নবী করীম (সা)-এর প্রতি ওহী নাযিল হয়। তখন তিনি হযরত সওদা (রা)-কে ডেকে বললেন ঃ

اِنَّهٗ اُذِنَ لَكُنَّ اَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ - بخارى

"হ্যাঁ প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি তোমাদের জন্যে রয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই।" (বুখারী, মুসনাদে আহমাদ)

সে সমাজের মহিলারা চাষাবাদের কাজ করতেন। গৃহপালিত পশু পালনের কাজ করতেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর মেয়ে হযরত সালমা (রা) ছিলেন হযরত জুবাইর (রা)-এর স্ত্রী। তিনি নিজেই তার ঘোড়াকে খাবার দিতেন। পানি পান করাতেন। এছাড়া ঘরের যাবতীয় কাজও তাকেই করতে হত। তিনি নিজে বাড়ী থেকে দুই মাইল দূরে অবস্থিত জমি থেকে খেজুর বীজ তুলে আনতেন। যাতায়াতের সময় পথে অনেক সময় রাসূলে করীমের (সা) সাথে দেখা হয়ে যেত। একবার কীলাহ নামের এক মহিলা রাসূলে করীমের (সা) কাছে যেয়ে বললেন ঃ "আমি একজন স্ত্রীলোক, আমি ব্যবসা করি।" পরে সে রাসূল (সা)-এর নিকট ব্যবসা সংক্রান্ত কয়েকটি মাসয়ালা জিজ্ঞেস করেন। হযরত উমরের (রা) খেলাফত আমলে হযরত আম্মা বিনতে মুহাররমা (রা) নামে একজন মহিলা সাহাবী আতরের ব্যবসা করতেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর স্ত্রী নিজে ঘরে বসে শিল্পকর্ম করতেন এবং তা বিক্রয় করে ঘর সংসারের খরচ চালাতেন। একদিন তিনি নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ

"আমি একজন কারিগর মেয়ে। আমি তৈরী করা দ্রব্য বিক্রয় করি। এছাড়া আমার স্বামীর এবং সন্তানদের জীবিকার অন্য কোন উপায় নেই।" নবী করীম (সা) বললেন ঃ "এভাবে উপার্জন করে তুমি তোমার ঘর সংসারের প্রয়োজন পূরণ করছ। এতে তুমি বিরাট সওয়াবের অধিকারী হবে।"

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, অর্থ উপার্জনের জন্যে কাজ করা বা বাইরে যাওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ তো নয়ই বরং তা সওয়াব লাভের উপায়। কিন্তু তা অবশ্যই ইসলামী সীমার মধ্যে থেকে হতে হবে।

ইসলামী সমাজে নারীদের যেসব অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছে রাসূল (সা)-এর কায়েম করা সমাজে তা তারা পুরাপুরি ভোগ করেছেন। কোথাও তাদের এ অধিকার খর্ব করা হলে বা তাদের উপর কোনরূপ

অবিচার করা হলে মহিলারা নিজেদের এ অধিকার সংরক্ষণের জন্যে পূর্ণ বিচক্ষণতার সাথে চেষ্টা চালিয়েছেন। ইসলামী আইন এসব ক্ষেত্রে তাদেরকে সহায়তা দিয়েছে।

রাসূল (সা)-এর যুগে একটি মেয়েকে তার পিতা তার ধনী ভাইপোর সাথে বিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু মেয়েটি ছেলেটিকে একেবারেই পছন্দ করেনি। মেয়েটি রাসূল (সা)-এর নিকট এ বিষয়ে অভিযোগ করলে তিনি বললেন ঃ "এই বিয়ে রক্ষা করা না করা তোমার ইচ্ছা।" মেয়েটি বলল ঃ "বাবার দেয়া বিয়ে আমি খতম করি না বটে, তবে আমি জানিয়ে দিতে চাই যে, মেয়েদের ইচ্ছা ও পছন্দের বিপরীত তাদের বিয়ে দেয়ার কোন অধিকার তাদের পিতার নেই।"

বারীরা নাম্নী এক ক্রীতদাসীর বিয়ে হয়েছিল মুগীস নামক এক ক্রীতদাসের সাথে। কিছুদিন পর বারীরা দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করেন। তখন সে মুগীসের স্ত্রী থাকতে অস্বীকার করে। একথা জানতে পেরে মুগীস দুঃখের আঘাতে আর্তনাদ করে উঠে। সে বারীরার পিছনে পিছনে দৌড়াতে থাকে এবং তাকে অনুরোধ করতে থাকে এই অস্বীকৃতি প্রত্যাহার করার জন্যে। এই দৃশ্য দেখে রাসূল (সা) সহানুভূতিতে বিষণ্ন হয়ে উঠেন এবং বারীরাকে পুনর্বিবেচনা করতে বলেন। বারীরা জিজ্ঞেস করলেন ঃ "এটা কি আপনার আদেশ ?" রাসূল (সা) বললেন ঃ "না আদেশ নয়, কেননা এ ব্যাপারে আদেশ করার কোন অধিকার আমার নেই। তবে আমি মুগীসের জন্যে তোমার কাছে সুপারিশ করছি।" নবীর সুপারিশ এবং নির্দেশে মৌলিকভাবে কোন পার্থক্য নেই জেনেও বারীরা বললেন ঃ "না ওর কাছে আমার কোন প্রয়োজন নেই।"

বারীরার এই অনমনিয়তার মূলে ছিল এই বিশ্বাস যে, ইসলামী শরীয়ত নারী সমাজকে যে অধিকার দিয়েছে সে অধিকার ভোগ করার জন্যে আইনের আনুকূল্যও সে লাভ করবে। এ কারণে সে সম্পূর্ণ নীর্ভিকভাবে স্বীয় সিদ্ধান্তে অবিচল থাকল। (বুখারী, আবু দাউদ)

রাসূলে করীম (সা)-এর সময়ে মহিলারা মসজিদে হাজির হয়ে জামায়াতে নামায পড়তেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) নিজে মেয়েদের মসজিদে যাওয়া পছন্দ করতেন না। তাঁর স্ত্রী বেগম আতেকা (রা)-ও নিয়মিত মসজিদে নামায পড়তে যেতেন। একদিন হযরত ওমর (রা) তাকে বললেন ঃ "তুমি জান যে, তোমার মসজিদে যাওয়া আমি পছন্দ করি না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি বিরত থাকছ না।" জওয়াবে তিনি বললেন ঃ "আল্লাহর শপথ আপনি স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ না করা পর্যন্ত আমি বিরত থাকব না।" সত্যই তিনি নিয়মিত মসজিদে গিয়েছেন। এমনকি, হযরত ওমর (রা) মসজিদে আততায়ীর হাতে যখন শহীদ হয়েছিলেন তখনও তিনি মসজিদে উপস্থিত ছিলেন।

"আল্লাহর দাসীকে মসজিদে আসতে নিষেধ করো না। তোমাদের মধ্যে কারও স্ত্রী যদি মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চায় তাহলে তাকে বাধা দিও না।" (বুখারী, মুসলিম)

"তোমাদের স্ত্রীদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দিও না। তবে তাদের গৃহই তাদের জন্যে অধিকতর ভালো।" (আবু দাউদ)

কিন্তু জামায়াতে নামাযের যে নির্দেশ পুরুষদের দেয়া হয়েছে নারীদেরকে তা দেয়া হয়নি। পুরুষের জন্যে মসজিদে জামায়াতে নামায উৎকৃষ্ট আর মেয়েদের জন্যে ঘরে নির্জনে নামায শ্রেষ্ঠ। যদিও মেয়েদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করা হয়নি। কিন্তু ঘরের নামাযকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। ইমাম আহমদ এবং তিবরানী উম্মে হুমাইদ সায়েদিয়া থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ সে বলল, "হে আল্লাহর রাসূল (সা) আমার মন চায় যে আমি আপনার সঙ্গে নামায পড়ি। নবী (সা) বললেন, আমি জানি। কিন্তু তোমার নিজের কামরায় নামায পড়ার চেয়ে এক নির্জন স্থানে নামায পড়া শ্রেয় এবং তোমার বাড়ীর দালানে নামায পড়ার চেয়ে তোমার কামরায় নামায পড়া শ্রেয় এবং তোমার মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে তোমার মহল্লায় নামায পড়া শ্রেয়।"

আবু দাউদ শরীফে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ "নারীর নিজের কামরায় নামায পড়ার চেয়ে নিভৃত কক্ষে নামায পড়া উত্তম এবং কুঠরীর চেয়ে চোরা কামরায় নামায পড়া উত্তম।"

বস্তুত এটা কোন নির্দেশ নয়। উপদেশ মাত্র। মেয়েরা ঘরের মধ্যে আলাদা জামায়াত করতে পারে এবং নিজেরাই ইমামতি করতে পারে। নবী করীম (সা) উম্মে ওরকা বিনতে নওফেলকে মেয়েদের জামায়াতে ইমামতি করার অনুমতি দিয়েছিলেন। (আবু দাউদ)

দারে কুতনী এবং বায়হাকী থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রা) মেয়েদের ইমামতি করেছিলেন এবং কাতারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছিলেন।

মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেয়ার সাথে সাথে কিছু শর্তও আরোপ করা হয়েছে।

হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, "নবী করীম (সা) বলেন, নারীদেরকে রাত্রিকালে মসজিদে আসতে দাও।" (তিরমিযী)

হযরত ইবনে ওমরের বিশিষ্ট শাগরেদ হযরত নাফে বলেন, "রাত্রিকালে এজন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, রাত্রির অন্ধকারে ভালভাবে পর্দা করা সম্ভব হবে।" (মিরমিযী)

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, "নবী করীম (সা) ফজর নামায এমন সময়ে পড়তেন যে, নামায শেষে নারীগণ যখন চাদর মুড়ি দিয়ে ঘরে ফিরতেন তখন অন্ধকারে তাদেরকে চিনতে পারা যেত না।" (তিরমিযী)

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদিন নবী করীম (সা) মসজিদে বসেছিলেন, এমন সময় মুয়ায়না গোত্রের একটি নারী সাজ-সজ্জা করে সেখানে আসল। তখন নবী করীম (সা) বললেন ঃ "তোমরা তোমাদের নারীদেরকে সাজ-সজ্জা করে মসজিদে আসতে দিও না।"(ইবনে মাজাহ)

সুগন্ধি সম্পর্কে নবী করীম (সা) বলেছিলেন ঃ "যে রাত্রে তোমরা নামাযে আসবে সে রাত্রে কোন রকমের সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করে আসবে না। একবারে সাদাসিদা পোশাকে আসবে।" (মুয়াত্তা, ইমাম মালিক)

"মসজিদে পুরুষদের সাথে একই সারিতে অথবা সামনের সারিতে মেয়েদের দাঁড়ানো নিষেধ। তাদেরকে পুরুষের পিছনের সারিতে দাঁড়াতে হবে।"

নবী করীম (সা) বলেন, "পুরুষের জন্যে উৎকৃষ্ট স্থান সম্মুখের কাতার এবং নিকৃষ্ট স্থান পিছনের কাতার এবং নারীদের জন্য নিকৃষ্ট স্থান সামনের কাতার এবং উৎকৃষ্ট স্থান পিছনের কাতার।"

বস্তুত ইসলামী শরীয়ত নারীদেরকে যে অধিকার দিয়েছে নারীরা সেই অধিকার অবাধে ভোগ করতে পারে এবং ইসলামী সমাজই এই অধিকারের সংরক্ষক। রাসূল (সা)-এর হাতে গড়া সমাজে যেমন মহিলাদের এই অধিকার পেতে কোন বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়নি আজকের সমাজেও যদি প্রকৃত ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলেও নারীরা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে।

কিন্তু এই স্বাধীনতার অর্থ কোনক্রমেই স্বেচ্ছাচারিতা নয়। ইসলামী সমাজে নারীকে ঘরের বাইরের জগতের কাজ থেকে মুক্তি দিয়েছে। কারণ, আমরা আগেই আলোচনা করেছি নারীর দৈহিক এবং মানসিক গঠন পুরাপুরি ঘরের অভ্যন্তরীণ কাজেরই উপযোগী। জীবিকার্জনের দায়িত্ব স্বামীর উপর অর্পণ করে নারীকে দেয়া হয়েছে ঘরের যাবতীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব।

"নারী স্বামী গৃহের পরিচালিকা এবং এই কাজের জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে।" (বুখারী)

"জুময়ার নামায নারীর উপর ওয়াজিব করা হয়নি। জানাযায় অংশগ্রহণ করা তার প্রয়োজন নেই। বরং এ থেকে তাকে বিরত রাখা হয়েছে।" (বুখারী)

নারীর জন্য জামায়াতে নামায পড়া এবং মসজিদে হাজির হওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়নি। যদিও কিছু নিয়ন্ত্রণ সহকারে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে কিন্তু তা পছন্দ করা হয়নি।

"নারীকে মহররম পুরুষের সঙ্গ ছাড়া ভ্রমণের অনুমতি দেয়া হয়নি।" (তিরমিযী)

মোটকথা নারীর প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হওয়া অপছন্দ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে ঃ وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ "তোমরা ঘরের মধ্যে বসবাস কর।" (সূরা আল আহযাব ঃ ৩৩)

কিন্তু এ বিষয়ে এতবেশী কড়াকড়ি করা হয়নি। উপরের আলোচনায় আমরা সেটা দেখেছি। কারণ, কখনো কখনো এমন হতে পারে যে, ঘরের বাইরে যাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এমন হতে পারে যে, কোন নারীর হয়ত অভিভাবক নেই। অথবা পরিবারে কর্তার আর্থিক দৈন্যতা, বেকারত্ব, অসুস্থতা, অক্ষমতা অথবা আরও বহু কারণে নারীকে ঘরের বাইরে কাজ করতে হয়। এ ব্যাপারে এজন্যে অনুমতি দেয়া হয়েছে।

"আল্লাহ তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন যে, তোমরা প্রয়োজনে বাড়ীর বাইরে যেতে পার।" (বুখারী)

কিন্তু এই অনুমতি একেবারে বল্গাহীনভাবে তাকে দেয়া হয়নি। বরং ইসলাম এর জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে।

"যে নারী আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার জন্যে জায়েজ নয় যে, সে তিনদিন অথবা তার বেশী দিন ভ্রমণ করে অথচ তার সঙ্গে তার পিতা অথবা ভাই, স্বামী বা ছেলে অথবা কোন মহররম পুরুষ নেই।" (তিরমিযী)

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ "নারী যেন একদিন-রাতের সফর না করে যতক্ষণ না তার সঙ্গে কোন মহররম পুরুষ থাকে।" (তিরমিযী)

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ "কোন মুসলমান নারীর জন্যে হালাল নয় যে, সে কোন মহররম পুরুষ ছাড়া এক রাত্রিও সফর করে।" (আবু দাউদ)

যদিও এই সমস্ত সফরের সময়ের ব্যাপারে মতভেদ আছে কিন্তু কোন অবস্থাতেই নারীকে একা দূরে পথ ভ্রমণ করার অনুমতি দেয়া হয়নি। আর এই অনুমতি না দেয়া কোনক্রমেই নারী স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ নয়। বরং এটা নারী প্রকৃতিরই স্বাভাবিক দাবী।

❐

পর্দাহীনতার কুফল

ইসলামী সমাজে নারীরা যে সম্মান, মর্যাদা ও স্বাধীনতা লাভ করেছে তা দুনিয়ার ইতিহাসে বিরল। এই সম্মান ও মর্যাদা সে এমনিতেই লাভ করেনি। বরং একটি সমাজে ইসলাম পরিপূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেই সমাজে অন্যান্য দিক এবং বিভাগে যেভাবে পূর্ণ ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে শান্তি কল্যাণ স্থাপিত হয়েছে, ঠিক তেমনই নারী সমাজও আল্লাহর বিধান পরিপূর্ণ রূপে পালন করার কারণেই সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছে। আল্লাহ প্রদত্ত এ বিধানের মধ্যে পর্দা একটি অন্যতম বিধান যার সঠিক অনুসরণ যেমন নারী জাতিকে সঠিক মর্যাদা দান করেছেন আবার তার লংঘনও তেমনি তাকে নিক্ষেপ করে নিকৃষ্টতম স্থানে।

শুধু নারী জাতির নয় ; বরং গোটা মানব জাতির উত্থান পতনই এর সাথে জড়িত। স্বভাবতঃই প্রশ্ন আসে পর্দা কি ? এটা কি শুধু নারীকে চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা ? অথবা শুধুমাত্র কাপড়-চোপড়ে জড়িয়ে একটি চলন্ত তাবু বানানো ? আসলে কি ?

আসলে মানুষকে আল্লাহ তৈরী করেছেন আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে। এই সেরা জীব মানুষকে সম্মানজনক ও মর্যাদা সম্পন্ন জীবন-যাপনের বিধানও দিয়েছেন নবী ও রাসূলের মাধ্যমে। যুগে যুগে তাঁরা শিখিয়েছেন কিভাবে পশু প্রবৃত্তি দমন করে সত্যিকার মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটানো যায়। মানুষ দুনিয়াতে যত অন্যায় কাজ করে সবই করে পশু প্রবৃত্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে।

তাই মানুষ যেন তার পাশবিক শক্তিকে অবদমিত করে যথার্থ মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়, সে জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাকে সর্বোত্তম নিয়ম-নীতি বা আইন-বিধান দিয়েছেন। কেবলমাত্র সেসব আইন-কানুনের অনুসরণ করেই সে তার সঠিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। পর্দা ব্যবস্থা আল্লাহর দেয়া এমন একটি উৎকৃষ্ট বিধান যা মানুষকে পাশবিক উচ্ছৃংখলা থেকে রক্ষা করে সত্যিকার মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে।

নারীরা আজ লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত। যার ফল স্বরূপ বিভিন্ন দিক এবং বিভাগ থেকে গড়ে উঠছে নারী মুক্তি, নারী অধিকার আদায়ের নামে আন্দোলন। পালিত হচ্ছে জাতিসংঘের উদ্যোগে বিশ্ব নারী দিবস ইত্যাদি। কিন্তু নারী কি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তার সঠিক মর্যাদায় ? বরং এর উল্টাটিই হচ্ছে। নারী অধিকার আদায়ের নামে পরিবারকে ধ্বংস করে নারীরা বেরিয়ে আসছে মাঠে-ময়দানে। পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতা করে দখল

করে নিতে চেষ্টা করছে তাদের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ক্রমান্বয়ে তারা পুরুষের লালসার ইন্ধন হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে তারা হচ্ছে লাঞ্ছিত, অপদস্থ। অনেকে এ অবস্থার জন্য সামাজিক পরিবেশকেই দায়ী করে থাকে। অনেকে আবার মেয়েদের হীনমন্যতাবোধ বা পশ্চাদপদ অবস্থাকে দায়ী মনে করে। কিন্তু মেয়েদের এ অবস্থার জন্যে দায়ী ইসলামহীনতা। আমাদের সমাজে যদি ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকত তবে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমেই মানুষ তার প্রকৃত মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারত এবং নারীরাও যদি সঠিকভাবে শালীনতা বজায় রেখে চলত এবং আল্লাহর দেয়া শ্রেষ্ঠ নেয়ামত নারীর রক্ষা কবজ পর্দার অনুসরণ করতো তাহলে ধর্ষণ, হত্যাসহ নারী নির্যাতন অনেকাংশে নয় বরং সমূলে উৎখাত হত।

পত্রিকার পাতা খুললেই আমরা দেখতে পাই নারীদের নির্যাতনের ঘটনা। এ নির্যাতন শুধু যে বাইরের লোক দ্বারাই হয় তা নয়। বরং অনেক সময় দেখা যায় নিকটাত্মীয় দ্বারাও এ নির্যাতন সংঘটিত হচ্ছে। এমনি একটি খবর। "আপন চাচার লালসায় শিকার কিশোরী সখিনা।" চাচার এক তরফা প্রেম প্রত্যাখ্যান করায় ক্ষুরের এলোপাতাড়ি আঘাতে মর্মান্তিকভাবে আহত যন্ত্রণা কাতর ১৩ বছরের সখিনা এখন শুধু বুকফাটা বিলাপ করছে। তার গোপন স্থানসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্ষুরের ১০টি আঘাত করা হয়েছে। এদিকে ঘাতক চাচা পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে এলাকায়ই ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝেমধ্যে সখিনাদের বাসায় এসে মামলা উঠানোর হুমকি দিচ্ছে। সূত্রাপুরের ডিষ্টিলারী রোডে শুক্রবার সন্ধ্যায় এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে একই বাড়ীর বাসিন্দা আপন চাচা ৩০ বছর বয়স্ক হামিদের দ্বারা।

(খবর, ২২শে জানুয়ারী–১৯৯০)

একটি দু'টি নয়, এমনি হাজারো খবর আমরা পাই পত্রিকার পাতায়। আর পত্রিকার পাতায় কয়টা খবরই বা আসে ?

এছাড়া তালাকের সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে চলেছে। এসবেরই মূলে রয়েছে পর্দাহীনতার কুফল, সমাজে যদি সঠিক পর্দাপ্রথা চালু থাকত—যদি থাকত নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা, তাহলে এ ধরনের অপরাধ অনেক কমে যেত।

টেলিভিশন, ভি. সি. আর, সিনেমা ইত্যাদিও এ ধরনের অপকর্মের জন্য দায়ী। সংবাদপত্রের একটি খবরের শিরোনাম, "টেলিভিশন তাকে কুকর্মে প্ররোচিত করেছিল।" এ, এফ, পি, জনায় ক্যালিফোর্নিয়ার সাজ লিয়াণ্ডোর পুলিশ একটি ১২ বছরের কিশোরকে তার ৫ বছরের সৎ বোনকে ধর্ষণ করার অভিযোগে গ্রেফতার করেছে। বালকটি জানায় একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠান তাকে এ ধর্ষণ কাজে ইন্ধন যুগিয়েছে। তার অভিভাবকরা যখন বিকালে কেনা-কাটার জন্যে বাইরে যায়, তখন সে তার সৎ বোনকে

বলাৎকার করে। এর আগে টেলিভিশন দেখে এটি তার মাথায় ঢোকে।
(খবর, ২৬শে জানুয়ারী-১৯৯০)

শুধু বিদেশেই নয় আমাদের দেশেও টেলিভিশনে কি শেখানো হয় ? সস্তা প্রেম আর অশ্লীলতা ছাড়া আমাদের উত্তরসুরীদেরকে এর মাধ্যমে আর কি শেখানো হচ্ছে ? এছাড়া Violence এবং সন্ত্রাসী কার্যকলাপের কথা আর নাই বা বললাম।

অন্য একটি খবর। শিরোনাম হচ্ছে ঃ মার্কিন মুলুকে 'প্রগতির' নমুনা। শতকরা ষাট ভাগ মহিলা আইনজীবী কর্মক্ষেত্রে যৌন নিপীড়নের শিকার। যুক্তরাষ্ট্রে আইন বিষয় বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কিংবা ল' ফার্মগুলোতে কর্মরত মহিলারা পেশাগত অভিজ্ঞতা ও পদোন্নতি সহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা লাভ করার ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার। নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, ৯শ আঠার জন মহিলা আইনজীবীর মধ্যে জরীপ চালিয়ে দেখা গেছে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ আইন ব্যবসায় নিয়োজিত হতে এসে যৌন উৎপীড়নের টার্গেটে পরিণত হন। ন্যাশনাল ল' জার্নাল এবং ওয়েষ্ট পাবলিশিং কোং পরিচালিত জরীপে সাড়া দিয়ে বহু মহিলা আইনজীবী তাদের বর্তমান অবস্থায় বিতৃষ্ণা ও হতাশা ব্যক্ত করে দীর্ঘ বক্তব্য রেখেছেন। এদের একজন বলেছেন, আমার সাথে একই ফার্মে কর্মরতা বেশীর ভাগ মহিলা বঞ্চনার এমন সব উদাহরণ উপস্থাপিত করতে পারেন যেগুলো শুনলে আপনার চুল খাড়া হয়ে উঠবে। এ ধরনের তের জন মহিলা অভিযোগ করেছেন, তারা ল' ফার্মে চাকুরী করতে এসে ধর্ষিতা হয়েছেন কিংবা তাদেরকে ধর্ষণের চেষ্টা চালানো হয়েছে অথবা তাদের উপর মারাত্মক হামলা করা হয়েছে। এ জাতীয় বেশীর ভাগ অপকর্মের নায়ক অফিসের বস্।

কর্মক্ষেত্রের এসব কার্যকলাপ অধিকাংশ মহিলার ব্যক্তিগত জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এদের কারো বিয়ে হচ্ছে দেরীতে। কেউ কেউ ঘনিষ্ট দাম্পত্য সম্পর্ক রাখতে পারছেন না। কোন কোন মহিলা বিয়ে ও চাকুরীর মধ্যে কোন্টা বেছে নেবেন, তা ঠিক করতে পারছেন না।

যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টা, বোষ্টন, শিকাগো, ক্লিভল্যাণ্ড, ডালাস, হিউষ্টল, লস এঞ্জেলস, মিয়ামী, ফিলাডেলফিয়া, নিউইয়র্ক, সানফ্রান্সিসকো, ওয়াশিংটন ও টাম্পাতে অবস্থিত বড় বড় ল' ফার্মগুলোতে নিয়োজিত মহিলাদের উপর এ জরিপ চালানো হয়। (সংগ্রাম, ২২শে জানায়ারী-৯০)

নারী স্বাধীনতার নামে যে সমস্ত দেশকে মডেল বানিয়ে আমরা চলছি, যে দেশগুলোকে আমরা নারী স্বাধীনতার স্বর্গ মনে করছি সে দেশের প্রকৃত অবস্থার দিকে আমাদের লক্ষ করা উচিত। পুরুষের সমান শ্রম দিয়েও তারা পুরুষের চেয়ে অর্ধেক মজুরী, সম্মান-মর্যাদা কিছুই পাচ্ছে না। বরং

বিভিন্নভাবে তারা নির্যাতিতা হচ্ছে। অফিসের বড় বস্, সহকর্মী কারও হাত থেকেই তারা রেহাই পাচ্ছে না। পক্ষান্তরে পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য নারীরা নিজেদেরকে রমণীয় কমনীয় করার জন্যে প্রাণপাত করছে। যার প্রতিফলন দেখা যায় রাস্তার মোড়ে মোড়ে, বিউটি পার্লারগুলোতে। এসব বিউটি পার্লারগুলোতে এমন সব উপকরণ ব্যবহার করা হয় যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর। তা সত্ত্বেও মেয়েরা নির্বিঘ্নে এগুলোতে ভিড় জমায় শুধু সাময়িক তৃপ্তি মেটানোর আশায়। আর এর ফলে সমাজে যৌন উচ্ছৃংখলতা সহ যাবতীয় অন্যায়-অনাচার অনুষ্ঠিত হয়। শুধু বর্তমান সমাজেই নয়, অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও আমরা দেখতে পাই যে, নারীদের বেপর্দা, বেহায়াপনা এবং উচ্ছৃংখলতার ফলেই সমাজে নেমে এসেছে বিপর্যয়।

উদাহরণ স্বরূপ, অতীতে রোমানরা যখন উন্নতির শীর্ষে পৌঁছালো, তখন তারা বিশ্বের অন্যান্য জাতির উপর প্রাধান্য অর্জন করল। ক্রমান্বয়ে তারা আরাম ও বিলাসিতার দিকে ঝুঁকে পড়লো। এছাড়া গ্রীসের বিধর্মীয় শিক্ষা এবং গ্রীকদের অনুগামী রোমানীয় বিজ্ঞানীদের শিক্ষা ইতিমধ্যেই রোমানদের মন-মস্তিষ্কে ও স্বভাবে প্রভাব বিস্তার করে বসেছিল। এর ফলে তারা নারীদেরকে পর্দার বিধি-বিধান থেকে মুক্ত করতে শুরু করল এবং নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা চলতে লাগল। ফলে রোমানদের মধ্যে এক ধরনের হীন অভ্যাস ও পঙ্কিল স্বভাব সৃষ্টি হল। এই সমস্ত বদ অভ্যাসের ফলে তাদের নৈতিক সাহসের অপমৃত্যু ঘটে, উদ্যম ও প্রেরণা নষ্ট হয় এবং স্বভাবে নীচতা দেখা দেয়। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ তাদের মধ্যে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, নৃশংসতা ও গৃহযুদ্ধের প্রসার ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত মনুষ্যত্ব ও নৈতিকতা তাদের মধ্য থেকে বিদায় নেয়। কুরআনে এ সম্পর্কে খুব পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে ঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ○ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ○

"আমি মানুষকে অতি উত্তম কাঠামোতে তৈরী করেছি পরে আবার তাদেরকে উল্টা দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি।" (সূরা আতত্বীন)

জাতীয় অধপতন যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে তখন রোমানদের চিন্তাধারা পাল্টাতে শুরু করে। তাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, নারী সমাজই সকল অনর্থের মূল। তখন তারা নারীদের প্রতি কঠোর আচরণ শুরু করে। রোমান পুরুষগণ তাদের মেয়েদেরকে মাংস খাওয়া, হাসা এবং কথাবার্তা বলা পর্যন্ত নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। এমনকি তাদের মুখে 'মাউজ সীয়ার' নামক এক রকম মজবুত তালা আটকিয়ে দেয়া হত। যাতে করে তারা কথা বলার জন্যে মুখ খুলতে না পারে। এটা শুধু সাধারণ মহিলাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে

সকল শ্রেণীর মহিলাদের উপরই এটা প্রযোজ্য হত। সপ্তদশ শতাব্দীর এক পর্যায়ে খোদ রোমেই উচ্চ পর্যায়ের মনীষীদের এক সমাবেশে এমন প্রশ্নও উত্থাপিত হয় যে, নারীর মধ্যেও কি প্রাণ আছে ?

নারীদের উপর তখন কঠোর নির্যাতন করা হত। তাদেরকে ঘোড়ার পিঠে বেঁধে দেয়া হত। ঘোড়া চারিদিকে ছুটাছুটি করত। ফলে এই বেচারীদের হাড়গোড় পর্যন্ত ভেঙে চুরমার হয়ে যেত। অথবা একদল নারীকে থামের সাথে বেঁধে দিয়ে তাদের নীচে এমনভাবে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হত যে, সেই আগুনের প্রচণ্ড তাপে তাদের মাংস গলে পড়ত এবং তাদের মৃত্যু হত।

আজ পাশ্চাত্য দেশসমূহও সেই দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। ওখানে নারীদেরকে লোভনীয় করে তোলার জন্য নিত্য নতুন উপকরণ তৈরী করছে। নারীরা পুরুষের ভোগের সামগ্রীতে পরিণত হচ্ছে। তাদেরকে পর্দার জগৎ থেকে বের করে চরম উচ্ছৃংখলতায় নিক্ষেপ করছে। নারীদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রংবেরং-এর সাজ-সজ্জা ও রূপচর্চার সরঞ্জাম আবিষ্কার করে নারীদের বিলাসপ্রিয় ও অসচ্চরিত্র করে তুলছে।

এর পরিণাম ফল কখনও জাতির জন্যে কল্যাণকর হবার নয়। জাতি যখন নৈতিক দিক থেকে দেউলিয়া হয়ে যায় তখন আবার তারা নারীদেরকে আগের চাইতে কঠোর বন্দীদশায় নিক্ষেপ করে।

নারী চিরদিনই এই টানাপোড়নের শিকার হয়ে এসেছে। ইসলাম নারীকে এই অসহায় অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে সঠিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইসলাম নারীদেরকে তার বিজ্ঞতাপূর্ণ বিধানসমূহের অটল ও সুদৃঢ় গণ্ডির মধ্যে আশ্রয় দান করেছে। ইসলামের এই বিধানসমূহ এমনই, যা মুসলমানদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং তারা নিজেদের দ্বীন পরিবর্তন না করা পর্যন্ত কোনমতেই এই নির্দিষ্ট ও সুদৃঢ় সীমারেখাকে বিলীন করে দিতে পারে না। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে, অমুসলিম জাতির নারীদের উপর যে সমস্ত বিপদ মুসিবত এসেছে মুসলিম মহিলাগণ সুদীর্ঘ সাড়ে চৌদ্দশত বছর যাবত এগুলো থেকে নিরাপদ রয়েছে। পর্দা এমন একটি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা যা নারীকে পুরুষের হাতের পুতুল বা খেলনা হওয়ার কবল থেকে বাঁচাতে পারে। রক্ষা করতে পারে পুরুষের কামপ্রবৃত্তির শিকার হওয়া থেকে। আসলে এই পর্দা প্রথা যুগে যুগে একটি ভুল ধারণার শিকারে পরিণত হয়েছে। মনে করা হয়েছে নারীকে কাপড়ে-চোপড়ে আবৃত রাখার নামই পর্দা বা তাকে চার দেয়ালের মধ্যে আটকে রাখার নামই পর্দা। পর্দার আসল রূপ এবং উদ্দেশ্য যদি সবার সামনে পরিষ্কার থাকত তাহলে শুধু মুসলমানগণই নয় বরং অমুসলিমগণও এ নেয়ামতের দিকে দ্রুত ধাবিত হত।

❑

পর্দা একটি বাস্তব প্রয়োজন

আগের আলোচনায় আমরা যুক্তি-প্রমাণসহ দেখার চেষ্টা করেছি যে, পর্দা শুধু ইসলামের একটি বিধান মাত্রই নয় বরং এটা মানব জীবনের জন্যে একটি বাস্তব প্রয়োজন।

একটি সুন্দর সুষ্ঠু সমাজ গড়ে তোলার জন্যে বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত পর্দার প্রকৃতরূপ অজানা থাকার কারণেই এর বাস্তবতা উপলব্ধি করতে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি। একদল যেমন শুধু কাপড়-চোপড়ে সর্বাঙ্গ মুড়ে থাকাকে পর্দা মনে করেছেন, তেমনি আর একদল মনের পর্দাকেই আসল পর্দা বলে ধরে নিয়েছেন। বস্তুত উভয় দলই চরম ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত রয়েছেন। শুধু বাহ্যিক পর্দা যেমন অর্থহীন তেমনি দেহকে অনাবৃত রেখে মনের পর্দা রক্ষার ব্যাপারটাও অবাস্তব। আল্লাহ নারী এবং পুরুষকে তৈরী করেছেন। আর তাদের মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন পরস্পরকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা। বিশেষ করে নারীকে কমনীয় সুন্দর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে আল্লাহ তৈরী করেছেন। একটি নারী যখন সুন্দর সাজ পোশাকে সজ্জিত হয়ে বাইরে বের হয় তখন স্বভাবতই অন্যের মুগ্ধদৃষ্টি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেখানে মনের পর্দা রক্ষা হয় কিভাবে ? মানুষকে তো আল্লাহ অনুভূতিহীন জড় পদার্থ বা দোষ-ত্রুটির উর্ধে ফেরেশতা করে তৈরী করেননি। কামনা-বাসনা উদ্রেককারী উপায়-উপাদান দিনরাত সামনে থাকার পর মানুষ নির্লিপ্ত থাকবে এটা সম্ভব নয়।

এজন্যেই নবুয়তের দ্বাদশ বর্ষে হিজরতের প্রাক্কালে ইসলামী রাষ্ট্র গড়ার মূলনীতি পেশ করতে যেয়ে সূরা বনী ইসরাঈলে আল্লাহ পাক যে ১৪টি মূলনীতি পেশ করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মূলনীতি হল ঃ "তোমরা যেনর কাছেও যেও না।" এ আয়াতে আল্লাহপাক যেনা করো না না বলে যেনার কাছেও যেও না বলে এমন এক সমাজ গড়ার ইঙ্গিত করছেন যেখানে পুরুষ এবং নারী মিলে পূত-পবিত্র পরিচ্ছন্ন এক সমাজ গড়ে তুলবে। যেনা-ব্যভিচার সংঘটিত হওয়ার কোন পরিবেশই সেখানে থাকবে না। নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার ফলে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং পরকালের জবাবদিহির অনুভূতি তাদের মনে অবর্তমান থাকলে স্বাভাবিকভাবেই একজন অন্যজনের প্রতি আকৃষ্ট হবে। এই আকর্ষণ যদি বিবাহ ছাড়াই হয় তবে সেটাই কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে ব্যভিচার। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ "চক্ষুদ্বয় ব্যভিচার করে, দৃষ্টি তাদের ব্যভিচার করে, হস্ত দ্বারা ব্যভিচার করে—স্পর্শ তাদের ব্যভিচার, পদদ্বয়

ব্যভিচার করে পথে চলা তাদের ব্যভিচার, কথোপকথন জিহ্বার ব্যভিচার, কামনা-বাসনা মনের ব্যভিচার, অবশেষে যৌনাংগ এ সকলের সত্যতা অথবা অসত্যতা প্রমাণ করে।"

দৃষ্টির অনিষ্টতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ○ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ ـ

"হে নবী ! মু'মিন পুরুষদেরকে বলে দিন তারা যেন নিজেদের চোখকে বাঁচিয়ে চলে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাযত করে। এটা তাদের পক্ষে পবিত্রতম নীতি। যা তারা করে আল্লাহ সে বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত। আর হে নবী ! মু'মিন স্ত্রীলোকদের বলুন, তারা যেন নিজেদের চোখকে বাঁচিয়ে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাযত করে।" (সূরা আন নূর ঃ ৩০-৩১)

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে ঃ "হে মানব সন্তান ! তোমার প্রথম দৃষ্টিতো ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু সাবধান ! দ্বিতীয়বার যেন দৃষ্টি নিক্ষেপ না কর।" (জাস্‌সাস)

হযরত আলী (রা)-কে বলা হয়েছিল ঃ "হে আলী ! প্রথম দৃষ্টির পর দ্বিতীয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করো না। প্রথমটি ক্ষমার যোগ্য কিন্তু দ্বিতীয়টি নয়।" আরও বলা হয়েছে ঃ

"হযরত জাবের (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হঠাৎ যদি দৃষ্টি পড়ে তাহলে কি করবো ? নবী করীম (সা) বললেন ঃ তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিও।" (আবু দাউদ)

সৌন্দর্য প্রদর্শনের ইচ্ছাও দৃষ্টির কুফলের একটা কারণ। কুরআন এই সকলের জন্যে "তাবাররুজে জাহেলিয়াত" নামে এক সার্বিক পরিভাষা ব্যবহার করেছে। স্বামী ছাড়া অন্যের মনোরঞ্জনের জন্যে যে সৌন্দর্য প্রদর্শন ও বেশভূষা করা হয় তাকেই বলে "তাবাররুজে জাহেলিয়াত"। এর জন্যে কোন আইন প্রণয়ন করা যায় না। এটা সম্পূর্ণ বিবেকের উপর নির্ভর করে। নিজের মনেই হিসেব করে দেখতে হবে যে, সেখানে কোন খারাপ বা অপবিত্র ইচ্ছা-বাসনা লুকিয়ে আছে কিনা। যদি থাকে তাহলে তার জন্যে আল্লাহর নির্দেশ ঃ

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولٰى -

"পূর্বতন জাহেলী যুগের মত সাজ-গোজ করে দেখিয়ে বেড়িও না।"
(সূরা আল আহযাব ঃ ৩৩)

যে সাজসজ্জার পিছনে কোন অপবিত্র ইচ্ছা নেই তা ইসলামী সাজ সজ্জা। যার মধ্যে বিন্দুমাত্র খারাপ ইচ্ছা আছে তা জাহেলী সাজসজ্জা।

জিহ্বা মানুষের কথাবার্তা বলার মাধ্যম। নারীদের ভিন পুরুষের সাথে প্রয়োজনে কথা বলা নিষেধ নেই। কিন্তু কোন খারাপ ইচ্ছা বা নিজেকে অপরের কাছে মোহনীয় করে তোলার বাসনায় যদি কোন কথা বলা হয় সেটা অন্যায়। এ সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণা ঃ

اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ج

"তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর তবে বাক্যালাপে কোমলতা অবলম্বন করো না যাতে দুষ্ট মনের কোন ব্যক্তি লালসা করতে পারে ; বরং সোজা সোজা ও স্পষ্ট বলো।" (সূরা আল আহযাব ঃ ৩২)

কথা বলার সময় হয়তবা যে বলছে তার মনে খারাপ চিন্তা নাও থাকতে পারে। কিন্তু যাকে বলা হচ্ছে সে হয়তো খারাপ চিন্তা করতে পারে। এ জন্যেই কুরআন শুরুতেই সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়। কুরআনের ঘোষণা ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ لا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ط

"যারা ইচ্ছা করে যে, মুসলমানদের মধ্যে নির্লজ্জতার প্রচার হোক, তাদের জন্যে পৃথিবীতেও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এবং আখেরাতেও।"
(সূরা আন নূর ঃ ১৯)

নির্লজ্জতা রোধের জন্যে এবং কারও প্রতি (নারী হোক বা পুরুষ) খারাপ ধারণা পোষণ থেকে বিরত থাকার জন্যে ইসলাম কোন স্ত্রীলোককে অনুমতি দেয়নি যে, সে তার স্বামীর কাছে অন্য কোন স্ত্রীলোকের অবস্থা বর্ণনা করবে বা দাম্পত্য জীবনের গোপন কথা কাউকে বলবে বা অন্যের কাছ থেকে শুনবে। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ "নারী-পুরুষকে নিষেধ করা

হয়েছে যে, তারা যেন তাদের দাম্পত্য সম্পর্কিত গোপন অবস্থা অপরের কাছে বর্ণনা না করে। কারণ, এতেও অশ্লীলতার প্রচার হয় এবং মনের মধ্যে প্রেমাসক্তির সঞ্চার হয়। (আবু দাউদ)

জামায়াতের সাথে নামাযে ইমাম যদি ভুল করেন কিংবা কোন ব্যাপারে তাকে সাবধান করার প্রয়োজন হয় তাহলে পুরুষদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছে 'সুবহানাল্লাহ' বলে সাবধান করার। কিন্তু নারীদেরকে বলা হয়েছে যে, তারা মুখে কিছু না বলে হাতের উপর হাতে আঘাত করবে।"

(আবু দাউদ, বুখারী)

অনেক সময় কথা না বলেও গতিবিধির সাহায্যে অন্যকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা হয়। এ সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণা ঃ

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ط

"তারা যেন পায়ের দ্বারা মাটিতে আঘাত করে না চলে। নতুবা যে সৌন্দর্য তারা গোপন রেখেছে তার অবস্থা জানতে পারবে।"(সূরা আন নূর ঃ ৩১)

ইসলাম একটা সুন্দর পূত-পবিত্র সমাজ গড়ার লক্ষে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দিকেও লক্ষ রেখেছে। সুগন্ধি একটি দুষ্ট মন থেকে অন্য দুষ্ট মনে সংবাদ পরিবহনের এক অতি সূক্ষ্ম মাধ্যম। সুবাসস্নাত বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে পথ চলতে অথবা কোন সভাস্থলে যেতে কোন মুসলিম নারীকে ইসলাম অনুমতি দেয় না।

নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ "যে নারী আতর বা সুগন্ধি দ্রব্যাদি ব্যবহার করে লোকের মধ্যে যাবে সে একটি ভ্রষ্টা নারী।"

"তোমাদের মধ্যে কোন নারী মসজিদে গেলে যেন সুগন্ধি দ্রব্যাদি ব্যবহার না করে।"

পুরুষদের জন্যে বর্ণহীন খোশবুদার আতর এবং নারীদের জন্যে উজ্জ্বল বর্ণের গন্ধহীন আতর উপযোগী।

ইসলাম মানুষের লজ্জা-শরমের যে সঠিক ব্যাখ্যা দিয়েছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তা বিরল। আজকাল পৃথিবীর সুসভ্য জাতিগুলোর দিকে লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই যে, তারা সৌন্দর্যের জন্যে বেশভূষা করে, সতরের জন্যে নয়। এমনকি পশু প্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্যে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হতেও তাদের বাঁধে না। ব্যক্তিগতভাবেই শুধু নয় বরং Collectively তারা পশুত্বকে উপভোগ করে। ন্যুড ক্লাবগুলো এর উদাহরণ।

ইসলাম পোশাক সম্পর্কে অত্যন্ত বাস্তব কথা বলে ঃ

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ط وَلِبَاسُ التَّقْوٰى لا ذٰلِكَ خَيْرٌ ط

"হে আদম সন্তান ! আমরা তোমাদের জন্যে পোশাক নাযিল করেছি যেন তোমাদের দেহের লজ্জাস্থানসমূহকে ঢাকতে পারো। এটা তোমাদের জন্যে দেহের আচ্ছাদন ও শোভা বর্ধনের উপায় আর সর্বোত্তম পোশাক হলো তাকওয়ার পোশাক।" (সূরা আরাফ ঃ ২৬)

এখানে পোশাকের উদ্দেশ্য আমরা জানতে পারি। পোশাক শুধুমাত্র সৌন্দর্যই বাড়ায় না এবং তৃপ্তিই আনয়ন করে না। বরং এটা মানুষের দেহকে ঢেকে রাখে। এটা মানুষের লজ্জাস্থানকে ঢেকে রাখে। লজ্জাস্থান ঢাকার তাগিদেই প্রথম মানুষ পোশাকের ব্যবহার শুরু করে। এটা মানব চরিত্রের কৃত্রিম দাবী নয়, বরং এ হচ্ছে মানব প্রকৃতির ঐকান্তিক গুরুত্বপূর্ণ দাবী। লজ্জা-শরম মানুষের সহজাত অনুভূতি। আল্লাহ সৃষ্টিগতভাবেই মানব প্রকৃতিতে এ অনুভূতি দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতিগত এ সত্যকে উপেক্ষা করে আধুনিকতার নামে তথাকথিত উন্নত বিশ্বের মানুষ এমন পোশাক পরছে যা তার লজ্জাস্থানসমূহ ঢাকতে অক্ষম। মানুষের লজ্জাস্থানসমূহকে কুরআনে 'সতর' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই আরবী শব্দটি শরীরের এমন স্থানকেই নির্দেশ করে যার প্রকাশকে মানুষ পছন্দ করে না। এই স্বাভাবিক লজ্জা-শরমের দাবী পূরণের জন্যে পশুর মত প্রাকৃতিক পোশাক জন্মগতভাবেই মানুষকে দেয়া হয়নি। বরং মানুষের প্রকৃতিতে পোশাক পরার প্রয়োজনবোধ জাগিয়ে দেয়া হয়েছে। কুরআন শরীফে আল্লাহ তায়ালা 'আন যালনা আলাইকুম লেবাসান' বাক্যটিতে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে প্রকৃতিগত এই দাবী বুঝার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। স্বভাবগত এই প্রয়োজনকে সামনে রেখে মানুষের জন্য পোশাকের নৈতিক গুরুত্বকে বুঝতে হবে। পোশাক যেমন মানুষের লজ্জাস্থানকে আবৃত করবে তেমনই হবে তার জন্য সৌন্দর্যবর্ধক। এটা যেমন শুধুমাত্র দেহের ভূষণ নয় তেমনি নয় লজ্জাস্থান নিবারকও।

"আর সর্বোত্তম পোশাক হচ্ছে তাকওয়ার পোশাক" অর্থাৎ পোশাক কেবল লজ্জাস্থান ঢাকার উপকরণ এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধির উপায়ই নয় বরং মানুষের পোশাক হতে হবে আল্লাহর ইচ্ছামাফিক। মানুষ এ দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতিনিধি। তাই যে মানুষের মধ্যে তাকওয়া তথা আল্লাহভীতি

বিদ্যমান তার পক্ষে কেমন করে এমন পোশাক পরা সম্ভব যা তার ঈমানের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ? কুরুচিপূর্ণ পোশাক, পুরুষের মেয়েলী পোশাক কি কখনো সুস্থ রুচীবোধের পরিচয় বহন করে ? এ জন্যেই আল্লাহ পাকের নির্দেশ এসেছে ঃ

"তোমার যে পোশাকের ভিতর দিয়ে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা যায় এবং সতর প্রকাশ হয়ে পড়ে, ইসলামের দৃষ্টিতে তা কোন পোশাকই নয়।"

"রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে সকল নারী কাপড় পরিধান করেও উলঙ্গ থাকে, অপরকে তুষ্ট করে এবং অপরের দ্বারা নিজে তুষ্ট হয় যুবতী উটের মত গ্রীবা বাঁকা করে ঠাঠ ঠমকে চলে তারা কখনও বেহেশতে প্রবেশ করবে না। এমনকি বেহেশতের গন্ধও পাবে না।"

এখানে একথাগুলো বলা হলো যে, এর থেকে ইসলামী চরিত্রের মান এবং তার চারিত্রিক স্পিট অনুমান করা যাবে। কুরআনে আরও বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى -

"তোমরা জাহেলী যুগের মত রূপ যৌবনের প্রদর্শনী করে বেড়িও না।" (সূরা আল আহযাব ঃ ৩৩)

ইসলাম সামাজিক পরিবেশ ও তার আবহাওয়াকে অশ্লীলতা ও গর্হিত কার্যাবলীর সকল প্ররোচক বিষয় থেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখতে চায়। এ জন্যেই মানুষের মধ্যে লজ্জার অনুভূতি সৃষ্টি করে। যাতে করে মানুষের মধ্যে খারাপ কাজের সামান্য প্রবণতা দেখা দিলে তা উপলব্ধি করে নিজের ইচ্ছাশক্তি দিয়ে অংকুরেই বিনষ্ট করতে পারে।

ইসলাম যাবতীয় অশ্লীলতা ও নগ্নতার মূলোচ্ছেদ করেছে এবং নারী পুরুষের জন্যে সতরের সীমারেখা নির্ধারণ করেছে। আজ উন্নত বিশ্বের অধিবাসীদের অবস্থা আরবের জাহেলিয়াতের চেয়ে কিছু ভিন্ন নয়। তারা একে অপরের সামনে বিনা দ্বিধায় উলঙ্গ হয়ে পড়ত। হাদীসে আছে ঃ "হযরত মিসওয়ার বিন মাখরামা (রা) একটি পাথর বহন করে আনছিলেন। পথের মধ্যে তার তহবন্দ খুলে গেল এবং তিনি এই অবস্থায় পাথর বহন করে আনছিলেন। নবী করীম (সা) দেখে বললেন ঃ "আপন শরীর আবৃত কর এবং উলঙ্গ অবস্থায় চলিও না।" (মুসলিম)

জাহেলিয়াতের যুগে মানুষ সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে কাবাঘর তাওয়াফ করত এবং এটাকে উৎকৃষ্ট ইবাদত মনে করত। নারীরাও তাওয়াফের সময় উলঙ্গ হয়ে পড়ত। মুসলিম 'কিতাবুত তাফসিরি' আরবের এই প্রথা বর্ণনা করেছেন

যে, একজন নারী উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করত এবং সমবেত লোকদেরকে বলতো ঃ "কে আমাকে একটি কাপড় দিবে যা দ্বারা আমি আমার শরীর ঢাকব ?" এভাবে উক্ত নগ্ন নারীকে বস্ত্র দান করা বিরাট পুণ্য কাজ মনে করা হত।

সে সময়ের স্ত্রীলোকদের পোশাক এমন হতো যে, বুকের কিছুটা অনাবৃত থাকত এবং বাহু, কোমর এবং হাঁটুর নীচে কিছুটা অনাবৃত থাকত। বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশেও আমরা অবিকল এই অবস্থা দেখতে পাই।

সতর আবৃত রাখার জন্যে রাসূল করীম (সা) স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন ঃ "যে আপন ভাইয়ের সতরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে অভিশপ্ত।"
(জাস্‌সাস আহকামুল কুরআন)

"কোন পুরুষ কোন পুরুষকে এবং কোন নারী কোন নারীকে যেন উলঙ্গ অবস্থায় না দেখে।" (মুসলিম)

"আল্লাহর কসম, আমার আকাশ থেকে নিক্ষিপ্ত হওয়া এবং দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাওয়া অধিকতর শ্রেয় এমন অবস্থা থেকে যে আমি কারও গুপ্তাঙ্গ দেখি অথবা কেউ আমার গুপ্তাঙ্গ দেখে।" (মাবসূত)

একবার নবী করীম (সা) যাকাতের উটের চারণ ভূমিতে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, উটের রাখাল উলঙ্গ হয়ে শুয়ে আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করলেন এবং বললেন ঃ "যে নির্লজ্জ সে আমাদের কোন কাজের নয়।"

এই সকল আদেশ-নির্দেশের সাথে সাথে নারী-পুরুষের শরীর ঢাকার সীমারেখাও ঠিক করে দেয়া হয়েছে। শরীরের যে অংশ ঢাকা ফরয করা হয়েছে তাকেই শরীয়াতের পরিভাষায় সতর বলা হয়। পুরুষের জন্যে নাভী এবং হাঁটুর মধ্যবর্তী অংশকে সতর বলা হয়েছে এবং আদেশ করা হয়েছে, যেন কেউ সতর অপরের সামনে না খোলে।

"আবু আইয়ুব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেন, হাঁটুর উপরে এবং নাভীর নীচে যা আছে তা ঢাকার অংশ।" (দারে কুতনী)

"পুরুষের জন্য নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকবার অংশ।" (মাবসূত)

"হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, হুজুর (সা) এরশাদ করেন, নিজের উরু কাউকে দেখিও না এবং কোন জীবিত অথবা মৃত ব্যক্তির উরুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিও না।" (তাফসীরে কবীর)

পুরুষের মত নারীরও সতরের সীমা দিয়ে দেয়া হয়েছে। নারীকে মুখমণ্ডল ও হাত দু'টো ছাড়া বাকী সমস্ত শরীর ঢেকে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

"নবী করীম (সা) বলেছেন, যে নারী আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তার জন্যে এর বেশী হাত খোলা রাখা জায়েজ নয়। এই বলে তিনি তাঁর হাতের কব্জির মধ্যস্থলে হাত রাখলেন।"(ইবনে জারীর)

"যখন কোন বালিকা সাবালিকা হয় তখন তার শরীরের কোন অংশই দৃষ্টিগোচর হওয়া উচিত নয়। শুধুমাত্র মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত দু'টো হাত দেখা যেতে পারে।" (আবু দাউদ)

"হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি একবার বেশভূষা করে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল্লাহ বিন তোফায়েলের সামনে আসলে নবী করীম (সা) অপছন্দ করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ রাসূল ! সেতো আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। নবী করীম (সা) তখন বললেন, যখন কোন বালিকা সাবালিকা হয়, তখন মুখমণ্ডল এবং দুটো হাত ছাড়া শরীরের কোন অংশ প্রকাশ করা তার জন্যে জায়েজ নয়, এই বলে তিনি তার কব্জির উপর এমনভাবে হাত রাখলেন যে, কব্জির মধ্যস্থল এবং তার হাত রাখার জায়গার মধ্যে একমুঠ পরিমাণ অবশিষ্ট রইল।"(ইবনে জারীর)

নবী করীম (সা)-এর শ্যালিকা হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) একবার মিহি কাপড় পড়ে তার সামনে আসলেন। কাপড়ের ভিতর দিয়ে তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা যাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে নবী করীম (সা) বললেন ঃ হে আসমা ! সাবালিকা হওয়ার পর ইহা এবং ইহা ছাড়া শরীরের দেখানো কোন অংশ স্ত্রীলোকের পক্ষে জায়েজ হয় না।" এই বলে নবী (সা) তার মুখমণ্ডল এবং হাতের কব্জির দিকে ইঙ্গিত করলেন।

(ফতহুল কাদীর)

হাফসা বিন্‌তে আবদুর রহমান একদা সূক্ষ্ম দোপাট্টা পরে হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরে হাজির হলেন। তখন তিনি তা ছিড়ে ফেলে একটা মোটা চাদর দিয়ে তাকে ঢেকে দিলেন। (ইমাম মালিক, মুয়াত্তা)

নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ "আল্লাহর অভিশাপ ঐ সকল নারীদের উপর যারা কাপড় পড়েও উলঙ্গ থাকে।"

হযরত ওমর (রা) বলেন ঃ "নারীদের এমন আটসাট কাপড় পড়তে দিও না যাতে শরীরের গঠন পরিস্ফুটিত হয়ে পড়ে।"

উপরের আলোচনা থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি যে, মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জি ছাড়া নারীর জন্য সমস্ত শরীর সতরের অন্তর্ভুক্ত।

সতর ঢাকার নির্দেশ শুধুমাত্র যুবতী নারীর জন্যেই প্রযোজ্য। যখন কোন নারী সাবালিকা হয় এবং যতদিন পর্যন্ত তার মধ্যে যৌন আকর্ষণ থাকে ততদিন পর্যন্ত সতর ঢাকার এই নির্দেশ বলবৎ থাকে।

কুরআনের নির্দেশ ঃ

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِىْ لَايَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ بِزِيْنَةٍ ط وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

"যে সকল অতি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক পুনরায় কোন বিবাহের আশা পোষণ করে না, তারা যদি দোপাট্টা খুলে রাখে তাহলে তাতে কোন দোষ নেই। তবে শর্ত এই যে, বেশভূষা প্রদর্শন করা যেন তাদের উদ্দেশ্য না হয়। এ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা তাদের জন্যে কল্যাণকর। আর আল্লাহ্ সবকিছুই জানেন ও শুনেন।" (সূরা আন নূর ঃ ৬০)

"বিবাহের আশা পোষণ করে না" কথাটির অর্থ যৌন স্পৃহা বা আকর্ষণ না থাকা। যারা বার্ধক্যে পৌঁছেছে, তাদের জন্যে পোশাক সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ শিথিল করার কারণ হচ্ছে এই যে, তাদের প্রতি শ্রদ্ধার দৃষ্টি ছাড়া কোন কুদৃষ্টি পড়ার আশংকা নেই।

এছাড়া সাবালক ছেলেদেরও ঘরে ঢোকার সময়ে অনুমতি নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যাতে করে ঘরে অবস্থানকালে অসতর্ক অবস্থায় যেন সতর কারও দৃষ্টিগোচর না হয়।

وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط

"তোমাদের ছেলেরা যখন বুদ্ধির পরিপক্কতা পর্যন্ত পৌঁছাবে, তখন তারা অবশ্যই যেন অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে। যেমন তাদের বড়রা অনুমতি নিয়ে ঘরে ঢোকে।" (সূরা আন নূর ঃ ৫৯)

অপর লোকদেরকেও অনুমতি নিয়ে বাড়ীতে ঢোকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

"হে ঈমানদারগণ ! গৃহস্বামীর অনুমতি ছাড়া কারও ঘরে ততক্ষণ পর্যন্ত ঘরের লোকদের নিকট থেকে অনুমতি না পাবে প্রবেশ করো না এবং যখন ঢুকবে তখন ঘরের অধিবাসীদেরকে সালাম বলবে। এই নিয়ম তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। আশা করা যায় যে, তোমরা এর প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখবে।" (সূরা আন নূর ঃ ২৭)

পারিবারিক জীবনে মানুষ যাতে করে নিরাপদ থাকতে পারে তার জন্যই এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আরববাসীগণ প্রথমে এ সমস্ত নির্দেশের কারণ বুঝতে পারেনি। এজন্য অনেক সময় তারা ঘরের বাইরে থেকে উকি মারতো। স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর সময় এ রকম ঘটনা একবার ঘটেছিল। একবার তিনি তাঁর হুজরায় ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি জানালা দিয়ে উঁকি মারলো। তিনি বললেন ঃ "যদি আমি জানতাম যে, তুমি উঁকি মারবে তাহলে তোমার চোখে কিছু ঢুকিয়ে দিতাম। অনুমতি নেয়ার আদেশতো দৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্যেই দেয়া হয়েছিল।" (বুখারী)

এরপর তিনি ঘোষণা করলেন ঃ যদি কেউ অনুমতি ছাড়া অপরের ঘরের ভিতরে তাকিয়ে দেখে তাহলে তার চোখ উৎপাটিত করার অধিকার ঘরের অধিবাসীদের থাকবে।" (মুসলিম)

এছাড়া অপরিচিত লোককে আদেশ করা হয়েছে যে, যদি অন্যের ঘর থেকে কিছু চাওয়ার দরকার হয় তাহলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে।

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْاهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ط ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ط

"তোমরা নারীদের কাছ থেকে যখন কিছু চাইবে, তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এতে তোমাদের এবং তাদের মনের জন্যে অধিকতর পবিত্রতা রয়েছে।" (সূরা আল আহযাব ঃ ৫৩)

জিনিসপত্র আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে নারী পুরুষ একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। ইসলাম এই ছিদ্র পথকেই বন্ধ করে দিয়েছে।

এছাড়া যত নিকটতম বন্ধু এবং আত্মীয় হোক না কেন, স্বামী ছাড়া অন্য কেউ নির্জনে কোন নারীর সঙ্গে থাকতে এবং তার শরীর স্পর্শ করতে পারবে না।

"উকবা বিন আমের (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ সাবধান ! নিভৃতে নারীদের নিকটে যেও না। জনৈক আনসার

বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল ! দেবর সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি ?" নবী করীম (সা) বললেনঃ "সেতো মৃত্যুর সমান।" (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

"স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন নারীর কাছে যেও না। কারণ শয়তান তোমাদের যে কোন একজনের মধ্যে রক্তের ন্যায় প্রবাহিত হবে।" (তিরমিযী)

"আমর বিন আস বলেন, স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন নারীর নিকটে যেতে নবী করীম (সা) আমাদেরকে নিষেধ করেছেন।" (তিরমিযী)

"আজ থেকে যেন কেউ স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন নারীর নিকট না যায়, যতক্ষণ তার কাছে একজন অথবা দু'জন লোক না থাকে।" (মুসলিম)

স্পর্শ না করার ব্যাপারে ইসলামের বিধি-নিষেধ রয়েছে।

নবী করীম (সা) বলেন ঃ "যদি কেউ এমন কোন নারীর হাত স্পর্শ করে যার সাথে তার কোন বৈধ সম্পর্ক নেই তাহলে পরকালে তার হাতের উপর জলন্ত অগ্নি রাখা হবে।"

হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ "নবী করীম (সা) নারীদের কাছ থেকে শুধু মৌখিক বায়আত গ্রহণ করতেন। তাদের হাত স্পর্শ করতেন না। বিবাহিতা স্ত্রী ছাড়া তিনি কোন নারীর হাত স্পর্শ করেননি। (বুখারী)

উসায়মা বিনতে রুকায়কা বলেন ঃ "আমি কয়েকজন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে নবী করীম (সা)-এর কাছে বায়আত করতে গেলাম। শিরক, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা অপবাদ ও নবীর নাফরমানী করা থেকে বিরত থাকার শপথ তিনি আমাদের কাছ থেকে গ্রহণ করলেন। শপথ গ্রহণ শেষ হলে আমরা বললাম—আসুন আমরা আপনার হাতে বায়আত গ্রহণ করি।"নবী (সা) বললেন, আমি হাত স্পর্শ করি না, শুধু মৌখিক শপথ গ্রহণ করি।" (নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

মুসলিম জাহানে আমরা পাশ্চাত্যের অনুকরণে রাসূলে করীম (সা) অনুসৃত এই রীতিনীতি ভুলুণ্ঠিত হতে দেখছি। খোদ আমাদের দেশেও কর্তা ব্যক্তিদেরকে যেমন বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে অপর স্ত্রীদের সাথে অবাধে করমর্দন করতে দেখা যায়, তেমনি তাদের স্ত্রীগণও একই কায়দায় অপর পুরুষের সাথে করমর্দন করতে দ্বিধা করে না। বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল্যবোধের দৃষ্টিতে এটা যতই প্রগতিশীল আচরণ হোক না কেন ইসলামী মূল্যবোধের সাথে এর কোনই সম্পর্ক নেই।

বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ভীনদেশী মেহমানদের স্বাগত জানাতে গিয়ে আমরা নিজস্ব কৃষ্টি ও সভ্যতা ভুলুণ্ঠিত করে তাদের রীতিনীতিকে অন্ধভাবে

অনুসরণ করে থাকি। এটা শুধু ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকেই আপত্তিকর নয় বরং একটি স্বাধীন জাতির স্বকীয় জাতিসত্তা ভুলুণ্ঠিত করার নামান্তর। প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের হীনমন্যতাবোধের কারণেই আমরা এরূপ করে আসছি। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, একটা সুন্দর সুষ্ঠু সমাজ গঠনের জন্যে পর্দা একটি অপরিহার্য প্রয়োজন।

পর্দা ব্যবস্থা আল্লাহ্ পাকের এমন একটি উত্তম বিধান যা মানুষকে পাশবিক উচ্ছৃংখলতা থেকে হেফাযত করে এবং মানুষকে তার প্রকৃত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। কুরআন শরীফে যে সমস্ত আয়াতে পর্দার আদেশ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ص وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ص وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ط وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

"আর হে নবী ! মু'মিন স্ত্রীলোকদের বল যেন তারা নিজেদের চোখকে বাঁচিয়ে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাযত করে ও নিজে দের সাজসজ্জা না দেখায়। কেবল সেসব জিনিস ছাড়া যা আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং নিজেদের বুকের উপর ওড়নার আঁচল ফেলে রাখে। আর নিজেদের সাজসজ্জা প্রকাশ করবে না কিন্তু কেবল এসব লোকের সামনে ঃ তাদের স্বামী, পিতা, স্বামীদের পিতা, নিজেদের ছেলে, বোনদের ছেলে, নিজেদের মেলামেশার স্ত্রীলোক, নিজেদের দাসী, সেসব অধিনস্ত পুরুষ যাদের অন্য কোন রকম গরজ নেই, আর সেসব বালক যারা স্ত্রীলোকদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে এখনো ওয়াকিফহাল হয়নি। তারা নিজেদের পা যমীনের উপর মেরে

চলাফেরা করবে না এভাবে যে নিজেদের যা তারা গোপন করে রেখেছে লোকেরা তা জানতে পারে। হে মু'মিন লোকেরা ! তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর নিকট তওবা কর, আশা করা যায় কল্যাণ লাভ করবে।" (সূরা আন নূর ঃ ৩১)

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝ وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى ۝ وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ـ

"হে নবীর স্ত্রীগণ ! তোমরা সাধারণ স্ত্রীলোকদের মত নও। তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর তবে বিনিয়ে বিনিয়ে কথা বলো না। যাতে দুষ্ট মনের কোন ব্যক্তি খারাপ আশা পোষণ করতে পারে ; বরং সোজা সোজা স্পষ্ট কথা বল। নিজেদের ঘরে থাক এবং আগের জাহেলী যুগের নারীদের মত সাজগোজ করে বেড়িও না। নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর।" (সূরা আল আহযাব ঃ ৩২-৩৩)

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ط ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

"হে নবী ! তোমার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ এবং মু'মিন মহিলাদেরকে বলে দাও, তারা যেন নিজেদের উপর নিজেদের চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে দেয়। এটা বেশী ভাল নিয়ম ও রীতি। যেন তাদেরকে চিনতে পারা যায় ও তাদেরকে উত্যক্ত করা না হয়। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" (সূরা আল আহযাব ঃ ৫৯)

উপরের আয়াতগুলোতে দেখা যায় পুরুষদেরকে শুধু এতটুকু তাগিদ করা হয়েছে যে, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং যৌন অশ্লীলতা থেকে আপন চরিত্রকে বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু নারীদেরকে এ দু'টি নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক আচার-আচরণ সম্পর্কেও অতিরিক্ত নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সমাজকে কলুষমুক্ত সুন্দর সমাজরূপে গড়ে তোলাই এর উদ্দেশ্য। উপরোক্ত আয়াতে "দৃষ্টি অবনমিত কর" বলে বুঝানো হয়েছে যেন কারও মুখের দিকে খারাপ দৃষ্টিতে না তাকায়। চোখকে ঐসব জিনিস থেকে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে যাকে হাদীসে চোখের ব্যভিচার বলা

হয়েছে। অপরিচিত নারীর রূপ সৌন্দর্য দেখে আনন্দ উপভোগ করা যেমন পুরুষের জন্যে অনাচার সৃষ্টিকারী তেমনই অপরিচিত পুরুষের রূপ সৌন্দর্য উপভোগ করাও নারীর জন্যে অন্যায়। এজন্যে দৃষ্টি অবনমিত রাখার কথা বলা হয়েছে।

দুনিয়াতে বাস করলে সবকিছুর দিকে দৃষ্টি পড়বেই। এটা কখনো বাস্তব নয় যে, কোন পুরুষ কোন নারীকে অথবা কোন নারী কোন পুরুষকে দেখবেই না। হঠাৎ কারও দিকে দৃষ্টি পড়লে দ্বিতীয়বার তাকানো নিষেধ করা হয়েছে।

عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نَظَرِ الْفُجَأَةِ فَقَالَ اَصْرِفْ بَصَرَكَ

"হযরত জারীর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ হঠাৎ যদি কারও ওপর নজর পড়ে যায় তাহলে কি করব ? উত্তরে তিনি বললেন ঃ দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও।" (আবু দাউদ)

عَنْ بَرِيْدَةَ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَلِيٍّ يَاعَلِيُّ لَا تَتْبَعِ النَّظْرَةَ فَاِنَّ لَكَ الْاُوْلٰى وَلَيْسَ لَكَ الْاٰخِرَةَ ـ

"হযরত বারিদাহ (রা) বলেন যে, নবী (সা) হযরত আলী (রা)-কে বললেন ঃ হে আলী ! প্রথম দৃষ্টির পর দ্বিতীয়বার তাকিও না। প্রথম দৃষ্টি ক্ষমা করা হবে কিন্তু দ্বিতীয়বার তাকালে তা ক্ষমা করা হবে না।" (আবু দাউদ)

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ نَظَرَ اِلٰى مُحَاسِنِ امْرَاَةٍ اَجْنَبِيَّةٍ عَنْ شَهْوَةٍ صُبَّ فِيْ عَيْنَيْهِ الْاٰنُكَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ

"নবী (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন অপরিচিত নারীর প্রতি যৌন লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, কিয়ামতের দিনে তার চোখে উত্তপ্ত গলিত লোহা ঢেলে দেয়া হবে।" (ফাতহুল কাদীর)

দুনিয়ার জীবনে চলতে যেয়ে এমন অনেক সময় আসে যখন অপরিচিত নারীকে দেখা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যদি চিকিৎসার প্রয়োজন হয় অথবা মামলা মোকদ্দমার সাক্ষী হিসেবে বিচারকের সামনে উপস্থিত হওয়ার দরকার হয় অথবা এমন কোন প্রয়োজন দেখা দেয় যখন সতর দেখা বা শরীর স্পর্শ করার দরকার হয়ে পড়ে, এ সময় নিয়ত যথাসম্ভব পরিষ্কার রাখতে হবে।

আবার কোন নারীকে বিবাহের জন্যে দেখা সম্পূর্ণ জায়েয।

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شَعْبَةَ اَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اُنْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّهُ اَحْرٰى اَنْ يُّؤْمَّ بَيْنَكُمَا ـ

"মুগীরা বিন শোবাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি একজন নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। নবী করীম (সা) তাকে বললেন ঃ তাকে দেখে নাও। কারণ, এটা তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও ঐক্য সৃষ্টি করতে অধিকতর উপযোগী হবে।" (তিরমিযী)

عَنْ سَهْلَ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ جِئْتُ لِاَهَبَ لَكَ نَفْسِيْ فَنَظَرَ اِلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ اِلَيْهَا ـ

"সাহল বিন সাদ থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা একজন নারী নবী করীম (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্যে আমি নিজেকে পেশ করছি। এতে নবী করীম (সা) তার দিকে তাকিয়ে দেখে নিলেন।" (বুখারী)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَاَخْبَرَهُ اَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَظَرْتَ اِلَيْهَا ؟ قَالَ لَا قَالَ فَاذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّ فِيْ اَعْيُنِ الْاَنْصَارِ شَيْئًا ـ

"হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর নিকটে বসেছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ আমি একজন আনসার নারীকে বিয়ে করার মনস্থ করেছি।' রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি কি তাকে দেখেছ ? সে ব্যক্তি বলল, 'না'। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তাকে দেখে নাও। কারণ, সাধারণত আনসারদের চোখে কিছু না কিছু দোষ থাকে।"

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَطَبَ اَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَاِنْ اِسْتَطَاعَ اَنْ يَنْظُرَ اِلٰى مَا يَدْعُوْهُ اِذَا نِكَاحَهَا فَلْيَفْعَلْ ـ

"জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ যদি তোমাদের মধ্যে কেউ কোন নারীকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেয় তাহলে যথাসম্ভব তাকে দেখা উচিত যে, তার মধ্যে এমন কিছু আছে কিনা যা উক্ত পুরুষকে বিবাহের জন্যে উদ্বুদ্ধ করে।" (আবু দাউদ)

অনাচারের পথরোধ করার জন্যে দৃষ্টি সংযমের নির্দেশগুলো যেমন পুরুষের জন্যে দেয়া হয়েছে তেমনি নারীর জন্যেও দেয়া হয়েছে।

"হাদীসে হযরত উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি এবং হযরত মায়মুনা নবী (সা)-এর নিকটে বসেছিলেন। এমন সময় অন্ধ হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম সেখানে আসলেন। নবী করীম (সা) বললেন ঃ "তার জন্যে পর্দা কর।" হযরত উম্মে সালমা বললেন ঃ "ইনি কি অন্ধ নন ? তিনি তো আমাদেরকে দেখতেও পারবেন না এবং চিনতেও পারবেন না।" নবী করীম (সা) বললেন ঃ "তোমরাও কি অন্ধ যে তাকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ না?"

মোটকথা সামাজিক পবিত্রতা রক্ষার জন্যে নৈতিক প্রশিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় আইন এমনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে অনাচারের যাবতীয় পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। পৃথিবীতে যত পাপ কাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে তা চোখের মাধ্যমেই হয়েছে। প্রথমে তা চোখ নির্দোষভাবেই দেখে। তখন নফ্স তাকে এই দেখার সপক্ষে ভাল ভাল যুক্তি দেয়। সেভাবে এটা তো শুধুমাত্র সৌন্দর্য আস্বাদন এবং এই সৌন্দর্য দেখে আনন্দ পাওয়া যায়। কাজেই এতে দোষ কোথায় ? কিন্তু ভিতরে ভিতরে শয়তান আনন্দ সম্ভোগের আকাঙ্খা বাড়িয়ে দেয় এবং শেষ পর্যন্ত সেটা মিলন কামনায় পৌঁছে। কেউ কি একথা বলবে যে, একটা ফুল দেখে মনের যে অবস্থা হয় একটি সুসজ্জিত সুন্দরী নারী দেখলেও মনে সেই পবিত্র ভাব সৃষ্টি হয় ? ইসলাম মানুষের প্রকৃতির দিকে লক্ষ রেখেই এ সৌন্দর্য উপভোগের জন্যে বৈধ পথনির্দেশ দিয়েছে বিবাহের মাধ্যমে। এ স্বল্পায়ুর জীবনে মানুষ যাতে করে তার উপরে অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক চাহিদাও মেটাতে সক্ষম হয় তার জন্যই ইসলাম একটা ব্যালান্সড বা মধ্যপথ মানুষের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। প্রাকৃতিক নিয়মকে লংঘন করে অত্যধিক আত্মসংযম করলে যেমন মনের লাম্পট্য বা চিন্তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না তেমনি বাধা-বন্ধনহীন জীবন-যাপন করলেও তার কুফল থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব হবে না।

উপরে যে দৃষ্টি সংযমের নির্দেশ আমরা দেখেছি তা নারী পুরুষ উভয়ের জন্যে সমানভাবে প্রযোজ্য। এ দৃষ্টি সংযমের সঙ্গে সঙ্গে নারীদের সৌন্দর্য প্রকাশের সীমারেখাও দিয়ে দেয়া হয়েছে।

১. নারী তার সৌন্দর্য তার স্বামী, পিতা, শ্বশুর, সৎ পুত্র, ভাই, ভাইপো, ভাগিনার সামনে প্রকাশ করতে পারে।

২. আপন অধীনস্ত গোলামের সামনে এবং এমন চাকরের প্রতি যার কোন আকাঙ্খা নেই।

হাফেজ ইবনে কাসীর এ নির্দেশের তাফসীরে বলেন, এর দ্বারা ঐ সকল মজুর, চাকর ও অনুগত লোক বোঝায় যারা চালাক চতুর নয়, নারীদের প্রতি যার কোন যৌন বাসনা নেই। এখানে ঐ জাতীয় লোককেও বুঝানো হয়েছে, যে বাড়ীর অধীনে একজন অনুগত চাকর, অথবা একজন ভিখারী হিসেবে সাহায্য গ্রহণ করতে চায়, সে বাড়ীর নারীদের প্রতি তার কোন যৌন বাসনা পোষণ করতে পারে না। এরপর বাড়ীর মালিকেরও এ বিষয়ে কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে যে, যে সকল পুরুষ ভৃত্যকে বাড়ীর ভিতরে আসার অনুমতি দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে কোন খারাপ অবস্থা দেখা যায় কিনা। অনুমতি দেয়ার পর কোন রকম সন্দেহ হলে আসা বন্ধ করতে হবে।

রাসূল (সা)-এর সময়ে এ রকম ঘটনা ঘটেছিল মদীনাতে। একজন নপুংসক ছিল, সে নবীর বিবিগণের সামনে যাতায়াত করত। একদা সে হযরত উম্মে সালমা (রা)-এর কাছে বসে তার ভাই হযরত আবদুল্লাহর সাথে আলাপ করছিল। এমন সময় নবী করীম (সা) সেখানে আসলেন। তিনি বাড়ীর মধ্যে ঢোকার সময় উক্ত নপুংসকে হযরত আবদুল্লাহর কাছে এ কথাগুলো বলতে শোনলেন ঃ "আগামীকাল যদি তায়েফ বিজয় হয়, তাহলে বাদিয়া বিনতে গায়লান সকফীকে তোমাকে দেখাব। তার অবস্থা এই যে, যখন সে সামনের দিক থেকে আসে, তখন তার পেটে চারটি ভাঁজ দেখা যায় এবং পিছন ফিরতে আটটি ভাঁজ।" এরপর সে অশ্লীল ভাষায় তার গোপনীয় অংগের প্রশংসা করল। নবী করীম (সা) একথা শুনে বললেন, হে আল্লাহর দুশমন ! তুমি তো তাকে খুব নিবিড়ভাবে দেখেছ। এরপর তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, আমি দেখছি যে, এ ব্যক্তি নারীদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। অতএব সে যেন তোমাদের কাছে না আসতে পারে।"

এরপর নবী (সা) তাকে মদীনা থেকে বের করে দিলেন। কারণ সে গায়লানের গোপনীয় অঙ্গের যে চিত্র অংকন করল তাতে নবী করীম (সা) মনে করলেন যে, তার মেয়েলী ধরন ও হাবভাব দেখে মেয়েরা তার সঙ্গে এমনভাবে মিশবে যেমন করে মেয়েদের সঙ্গে মিশে। এ সুযোগে ঐ ব্যক্তি মেয়েদের ভিতরের অবস্থা জেনে পুরুষের কাছে তার প্রসংসা করে। ফলে বিরাট অনিষ্ট হতে পারে।

৩. যে সকল বালকের মধ্যে এখনও যৌন অনুভূতি সঞ্চার হয়নি, তাদের সামনেও সে সৌন্দর্য প্রদর্শন করতে পারে। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

اَوِالطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ-

"এমন বালক যে নারীদের গোপন কথা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়নি।"

৪. সবসময় মেলামেশা করা হয় এমন মেয়েদের সামনে মেয়েদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করা জায়েয আছে। এমনসব নারীর সামনে সৌন্দর্য প্রদর্শন করা যাবে না যাদের চাল-চলন সন্দেহযুক্ত অথবা যাদের চরিত্রে কলংক ও লাম্পট্যের ছাপ আছে। কেননা, এরাও অনাচার, অমঙ্গলের কারণ হতে পারে।

শাম দেশে মুসলমানেরা যাওয়ার পর তাদের মহিলারা ইহুদী-খৃষ্টান মহিলাদের সাথে মেলামেশা আরম্ভ করলে হযরত ওমর (রা) শামের শাসনকর্তা হযরত আবু ওবাদাহ বিন জাররাহকে লিখে জানালেন, যেন মুসলমান মহিলাগণকে আহলে কিতাব মহিলাদের সাথে হাম্মামে (স্নানাগারে) প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়। (তফসীরে ইবনে জারীর)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ব্যাখ্যা করে বলেন যে, মুসলমান মহিলাগণ কাফির এবং জিম্মি নারীদের সামনে ততটুকুই প্রকাশ করতে পারে, যতটুকু অপরিচিত পুরুষের সামনে করতে পারে। (তফসীরে কবীর)

কোন ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা এসবের উদ্দেশ্য নয় বরং যে সকল নারীর স্বভাব চরিত্র জানা নেই অথবা ইসলামের দৃষ্টিতে আপত্তিকর এ ধরনের নারীদের প্রভাব থেকে মুসলমান নারীদের রক্ষা করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। অমুসলিম নারীদের মধ্যে যারা সম্ভ্রান্ত ও লজ্জাশীলা তারা এর মধ্যে শামিল নয়।

এটি শুধু কুরআন সুন্নাহর কথাই নয় বরং আধুনিক যুগে অমুসলিমদের পর্যবেক্ষণ রিপোর্টও অবিকল এর অনুরূপ। যেসব মহিলা বাইরের জগতে বেপর্দা চলাফেরা করে এবং পুরুষের মত কাজে অংশ নেয় তাদের মধ্যে নারীসুলভ গুণাবলী হ্রাস পায় এবং তারা সমাজের জন্যে মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। সম্প্রতি (১৯৮৯ সালের ১৭ই ডিসেম্বর) বন থেকে প্রকাশিত এ, এফ, পি-র রিপোর্টে বলা হয়েছে, "মহিলা ক্রীড়াবিদদের বেশীর ভাগই সমকামিতায় আসক্ত।"—পশ্চিম জার্মানীর মহিলা সমাজ বিজ্ঞানী বার্গটি পালজন একথা জানিয়েছেন। মহিলা ক্রীড়াবিদদের যৌন জীবন সম্পর্কে তিনি ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান চালানোর পরে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলা বিশেষত ফুটবল, হ্যাণ্ডবল এবং টেনিসে অংশগ্রহণকারী মহিলা খেলোয়াড়দের ৯০ শতাংশই সমকামিতায় আসক্ত।

পাল্‌জকিন এ ব্যাপারে ১৯জন মহিলা ক্রীড়াবিদদের সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন। এদের সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ "নারীসুলভ বৈশিষ্ট না থাকায় তাদের স্বাভাবিক নারী রূপে গ্রহণ করা কষ্টকর।"

"একজন মহিলা ক্রীড়াবিদ ও 'একজন মহিলা' হওয়ার মধ্যে যে বিরোধ রয়েছে তার মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করতে গিয়ে অনেক তরুণী একেবারেই খেলাধূলা ছেড়ে দেয়।" (সংগ্রাম)

শুধু ক্রীড়া জগতেই নয়—বাইরের জগতের পুরুষালী কাজ সবই নারীত্বের উপর চরম আঘাত স্বরূপ এবং দীর্ঘদিন এসব কাজের ফলে নারী যে নারীত্ব হারায় এবং চরম মাশুল দিতে হয় আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে তা অস্বীকার করার আর কোন উপায় নেই।

ইসলামে নারীর জন্যে যে সীমারেখা দেয়া হয়েছে তা ব্যক্তি এবং সমাজের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যেই। নারীর সৌন্দর্য প্রকাশের যে গণ্ডি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে তাতে নারীর নারীসূলভ চাহিদা মেটে ; কিন্তু সমাজে তার সৌন্দর্য ও বেশভূষার দ্বারা কোন অবৈধ উত্তেজনা সৃষ্টি এবং যৌন উচ্ছৃংখলতার আশংকা থাকে না। মহিলারা যদি সুন্দর বেশভূষা সহ এমন লোকের সামনে আসে যারা যৌন লালসা রাখে এবং মুহররম হওয়ার কারণে যাদের মনের যৌন লালসা পবিত্র ভাবধারায় পরিবর্তিত হয়নি, তাদের প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে মানবিক চাহিদা অনুসারেই হবে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সুন্দর বেশভূষা সহকারে নারীদের প্রকাশ্য চলাফেরার ফলে অসংখ্য মানুষের প্রকাশ্য ও গোপন মানসিক ও বৈষয়িক ক্ষতি হচ্ছে।

এছাড়া নারীদের মধ্যেও সাজসজ্জার প্রবণতা ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে। শহরের সর্বত্র গজিয়ে উঠা ক্রমবর্ধমান বিউটি পার্লারগুলোই এর সাক্ষী। এসব বিউটি পার্লারগুলোতে সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্যে যে সমস্ত উপকরণ ব্যবহার করা হয় তা কোন কোন ক্ষেত্রে শরীরের জন্যে মারাত্মক ক্ষতিকর হয়, এমনকি এর ফলে দুরারোগ্য ব্যাধি পর্যন্ত হতে পারে। তা সত্ত্বেও সুন্দরী সাজার আকাঙ্খায় তরুণীরা ভীড় করে এসব পার্লারগুলোতে। এছাড়া নিজেকে পাতলা ছিপছিপে রাখার জন্যে জীবন বাজী রেখে এরা চেষ্টা করে। আমি সম্প্রতি এক মেয়েকে জানি। যে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়েছে ডায়েটিং করতে যেয়ে। সৌন্দর্যের বিশেষজ্ঞরা দেহের যে মাপ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে তার থেকে এক ইঞ্চি যেন এদিক ওদিক না হয় তার জন্যে এরা আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, অন্যের চোখে অপ্সরী সাজা

ছাড়া যেন এদের দ্বিতীয় কোন লক্ষ নেই। এ লক্ষে পৌছার জন্যে এরা অনাহারে কাটায়, পুষ্টিকর খাদ্য দ্রব্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে, লেবুর রস, তিক্ত কফি এবং এ ধরনের হাল্কা পানাহারে এরা দিন কাটায়। চিকিৎসকের বিনা পরামর্শে অথবা পরামর্শের বিপরীত এমনসব ঔষধ তারা ব্যবহার করে যার ফলে তারা ক্ষীণ এবং দুর্বল হয়ে পড়ে। এ উন্মাদনার বশে অনেক নারী জীবন দিয়েছে এবং দিচ্ছে। এসব কিসের জন্যে ? এসব কি একেবারে নিষ্পাপ আকাঙ্খা ? এর ফলে সমাজে যে অনাচার সৃষ্টি হতে পারে ইসলাম তা সূচনাতেই বন্ধ করতে চায়। কারণ, তার দৃষ্টি সৌন্দর্য প্রকাশের বাহ্যত আপাতঃ নিষ্পাপ সূচনার উপর নিবদ্ধ নয়, বরং এর যে ভয়ানক পরিণাম রয়েছে সেটা রোধ করাই এর উদ্দেশ্য।

কিন্তু সৌন্দর্য প্রকাশে বাধা নিষেধের সঙ্গে সঙ্গে আপনা আপনি যে সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে সেগুলো প্রকাশের অনুমতি ইসলাম দিয়েছে। তবে তাতে অন্যকে প্রলুব্ধ করার বা সামাজিক অনাচার সৃষ্টির বিন্দুমাত্র ইচ্ছা যেন না থাকে এ বিষয়টি গভীরভাবে লক্ষ রাখতে হবে। অবশ্য কোন ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি ইসলামের কাম্য নয়। সীমাহীন সৌন্দর্য বিলাস যেমন ইসলাম পছন্দ করে না তেমনি সৌন্দর্য্যের ব্যাপারে শীতল নিস্পৃহতাও ইসলাম অপছন্দ করে।

❐

ইজতেহাদের নামে স্বেচ্ছাচারিতা

ইসলাম একটি সার্বজনীন চিরন্তন বাস্তবধর্মী আদর্শের নাম। যা মূলত আল্লাহ প্রদত্ত নবী-রাসূল প্রদর্শিত। মুহাম্মদ (সা) সর্বশেষ নবী এবং কুরআন সর্বশেষ কিতাব হওয়ার কারণে ভবিষ্যতে আর কোনো নবী আসবে না—আর কোনো কিতাব আসবে না। কিন্তু কিয়ামত পর্যন্ত ইসলাম থাকবে সকল যুগের সকল জামানার চাহিদা পূরণের যোগ্যতা সক্ষমতা সহকারেই। এভাবে সর্বযুগের সর্বকালের উপযোগী চির আধুনিক মতাদর্শ হিসেবে ইসলামের টিকে থাকার ভিত্তি হলো কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইজতেহাদের সুযোগ থাকা।

এদিক দিয়ে ইসলামী আইন-কানুন ও বিধিবিধানের কার্যকারিতা ও গতিশীলতার জন্যে কুরআন-সুন্নাহ এবং ইজমার পাশাপাশি ইজতেহাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। তবে এ ইজতেহাদ শর্তহীন এবং বল্গাহীন হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ইজতেহাদের জন্যে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন ও আয়েম্মায়ে মুজতাহেদীনের গৃহীত নীতিমালা অনুসরণ ছাড়া ইজতেহাদ অনাচার ও স্বেচ্ছাচারিতার জন্ম দিতে পারে। বিষয়টি আলেম-ওলামা, বুদ্ধিজীবী, গবেষক ও তাত্ত্বিকদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

অতি সম্প্রতি "ইসলামের পর্দার বিধান" প্রসঙ্গে একজন গবেষকের নিজস্ব ধ্যান-ধারণার আলোকে কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা করার প্রবণতা এক পর্যায়ে স্বেচ্ছাচারিতার রূপ নিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে—ইজতেহাদের জন্যে প্রথমত কুরআন-হাদীসের মূল ভাষায় তার আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ বুঝার মত যোগ্যতা অর্জন অপরিহার্য। সেই সাথে কুরআন-হাদীসের Spirit বহাল রেখে এখলাসের সাথে শরীয়তের অধিকতর সঠিক সিদ্ধান্ত জানার, বুঝার প্রচেষ্টার নামই ইজতেহাদ। নিজের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত কোনো ধারণা বা সিদ্ধান্তের সপক্ষে কুরআন হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে কৃত্রিমভাবে যুক্তি দাঁড় করিয়ে টেনে হিঁচড়ে তাকে শরীয়তের বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রবণতা শরীয়তের পরিভাষা অনুযায়ী ইজতেহাদ নামে পরিচিত না হয়ে তাকে স্বেচ্ছাচারিতা বলাই যুক্তিযুক্ত।

ইসলামী শরীয়তের বিধান মতে নারীদের পর্দার ক্ষেত্রে মুখমণ্ডল ঢাকা না ঢাকা নিয়ে আয়েম্মায়ে মুফাসসিরীন, মুহাদ্দেসীন ও ফিকাহবিদদের

মধ্যে যে মতপার্থক্য দেখা যায় তার ভিত্তি কুরআন এবং হাদীসে ব্যবহৃত কিছু শব্দ, বাক্যের অর্থ এবং প্রয়োগ প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার সুযোগ থাকার কারণে সার্বিকভাবে এর উপর পর্যালোচনা করে কাজটা অধিকতর সঠিক এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হলে ঐ সব শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক শব্দ সম্পর্কে পারদর্শী হওয়া এবং যে সমস্ত আইয়েম্মায়ে মুজতাহেদীন এ নিয়ে কথা বলেছেন—তুলনামূলকভাবে কোন্‌টাকে অগ্রাধিকার দেয়া সমীচীন এ সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া ছাড়া নিছক মতপার্থক্যের সুযোগ নিয়ে অন্ধভাবে কোনো একটা মতকে সঠিক বলে চালিয়ে দেয়া কিছুতেই ইসলামের দাবী হতে পারে না।

মুখমণ্ডল খোলা এবং ঢাকা প্রসঙ্গে সূরায়ে নূরে উল্লেখিত নারীদের জিনাত প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে "ইল্লা মা জাহারা মিনহা .... (আয়াত ঃ ৩১) দিয়ে যে একান্তই স্বাভাবিকভাবে জীনাতের প্রকাশ ঘটে সেটাকে এ নিষেধাজ্ঞার আওতা বহির্ভূত রাখা নিয়েই আসলে মতপার্থক্য। দ্বিতীয়ত ঃ সূরা আহযাবে উল্লেখিত ঃ "ইয়ুদনিনা আলাইহিন্না মিন জালাবি বিহিন্না. .....(আয়াত ঃ ৫৯) এখানে জিলবাবের অর্থ জিলবাব ঢেকে দেয়ার পদ্ধতি প্রক্রিয়া নিয়েই মতপার্থক্য। তবে এ মতপার্থক্যের মধ্যে আমরা কোন্‌টাকে অগ্রাধিকার দিতে পারি এ সিদ্ধান্ত নিতে হলে যেমন একদিকে আরবী ভাষার শাব্দিক-পারিভাষিক ও প্রায়োগিক অর্থ নিয়ে আলোচনা করা উচিত। তার পাশাপাশি যাদের মাঝে কুরআন মজীদ নাযিল হয়েছে, সরাসরি যাদেরকে লক্ষ করে নাযিল হয়েছে, তারা এগুলোর উপরে কিভাবে আমল করেছেন ; হাদীসের বিভিন্ন কথা কোন্ সময় এবং পটভূমিতে এসেছে এটাও খেয়াল রাখতে হবে। এরপর পরবর্তীতে যারা এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন তাদের কথাগুলোর সার্বিক পর্যালোচনা করে Merit-এর দিক থেকে কোন্ কথাগুলো কুরআনের ও হাদীসের Spirit-এর সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল এ দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

আমি এ প্রসঙ্গটি আলোচনায় আনছি মূলত অতি সম্প্রতি প্রকাশিত "মুসলিম নারীর পোশাক ও কর্ম" শীর্ষক পুস্তকে লেখকের মুখমণ্ডল খোলা রাখা অপরিহার্যতা প্রমাণ করার ক্ষেত্রে অযৌক্তিকভাবে কুরআন শরীফের কিছু আয়াতের উদ্ধৃতি পেশ করা এবং তার স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা দানের অপপ্রয়াস লক্ষ করেই। লেখক যদি পর্দা শীর্ষক সূরা নূর ও আহযাবের আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রাচীন ও বর্তমান তাফসীরবিদ, হাদীসবিদ ও ফিকাহবিদগণের মতামতের উপর পর্যালোচনামূলক আলোচনায় মৌলিকত্বের স্বাক্ষর রাখতে পারতেন তাহলে তাকে সাধুবাদ দিতে আপত্তির কোনো

কারণ থাকত না। কিন্তু লেখক সেদিকে না গিয়ে কুরআন ব্যাখ্যার ইসলামী নীতি-নৈতিকতার বাঁধনমুক্ত হয়ে মুখমণ্ডল খোলা রাখার অপরিহার্যতা প্রমাণের জন্যে একান্তই অপ্রাসঙ্গিক কিছু আয়াতের উদ্ধৃতি ও অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছেন যার প্রতিবাদ করা ঈমানের অনিবার্য দাবী।

লেখক তার পুস্তকে নারীর মুখমণ্ডল খোলা রাখার ব্যাপারে কুরআনের সমর্থন এ অধ্যায়ে হযরত সুলায়মান (আ)-এর সম্পর্কে সূরা নমল এর উল্লেখিত প্রসঙ্গ টেনে তিনি মন্তব্য করছেন, "সুলাইমান (আ) একজন নবী। আমরা তাকে একজন নারীর সাথে কথোপকথনে রত দেখলাম। কিন্তু ঐ কথোপকথনের সময় সাবার রাণীর মুখে কোনো আবরণ ছিল না। আবার তিনি যখন কাফির ছিলেন তখনও তার মুখে কোনো আবরণ ছিল না। আবার তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখনও কোনো আবরণ টেনে দিতে আমরা দেখলাম না। কুরআন মজিদ এক্ষেত্রে একজন পুরুষ ও নারীর সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথোপকথনের দৃশ্যটি তুলে ধরেছে।" এখানে প্রশ্ন জাগে লেখক এখান থেকে মুখ খোলা রাখার অপরিহার্যতা বা অনুমোদনের যুক্তি নিচ্ছেন কিসের ভিত্তিতে ? এখানে সাবার রাণীর মুখের আবরণ ছিল একথার যেমন উল্লেখ নেই তেমনি ছিল না একথারও কোনো উল্লেখ নেই। দ্বিতীয়তঃ সকল নবীর দ্বীন এক ও অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও শরীয়ত ভিন্ন ভিন্ন। সকল নবীর উপর ঈমান আনা যেমন অপরিহার্য তেমনই সকল নবীর শরীয়ত মানা জরুরী নয়। শুধু মুহাম্মদ (সা)-এর শরীয়ত মানাই আমাদের জন্য অপরিহার্য। মানব ইতিহাসের একটি পর্যায় পর্যন্ত আপন ভাই বোনের মধ্যে বিবাহ বৈধ ছিল। লেখক কি আজকের দিনে সেটাকেও বৈধ করতে চাইবেন ?

লেখক এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় উদ্ধৃতি দিয়েছেন সূরা "হুদ" এবং সূরা "যারিয়াতে" ইবরাহীম (আ)-এর প্রসঙ্গ টেনে। লেখক এ দু'টি আয়াত উল্লেখ করার পর তার নিজের বক্তব্যে বলছেন, "হযরত ইবরাহীম (আ) হলেন ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক। আমরা মুসলিমরা প্রকৃতপক্ষে মিল্লাতে ইবরাহীমেরই অনুসারী। ইবরাহীম (আ) অত্যন্ত অতিথি বৎসল ছিলেন। আহার গ্রহণের পূর্বে প্রতিদিন তিনি একজন অতিথির অপেক্ষায় পথ চেয়ে থাকতেন। একদিন তার বাড়ীতে কিছু অপরিচিত অভ্যাগত আসলেন। ইবরাহীম (আ) তাদের পরিচয় জানার পূর্বেই তাদের সামনে একটি ভুনা করা বাছুর অতিথি সৎকারের জন্যে পেশ করলেন। কিন্তু যখন দেখলেন তার মেহমানরা কোনো খাদ্য গ্রহণ করছেন না, তখন তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, তার মেহমানরা আসলে মানুষ নন। মানুষের ছদ্মাবরণে

আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রেরিত ফেরেশতা। .....তিনি তাঁর মুখ চাপড়াতে চাপড়াতে অতিথিবৃন্দের সামনে এসে জানালেন তিনি ও তার স্বামী দু'জনেই বৃদ্ধ। আর তাছাড়া তিনি নিজে বন্ধ্যা। তিনি অবাক বিস্ময়ে জানতে চাইলেন তার সন্তান হতে পারে কি করে। জবাবে আগত অপরিচিত মেহমানরা জানালেন যে, আল্লাহরই ইচ্ছা এটা এবং আল্লাহর কোনো ইচ্ছা বা ক্ষমতার ব্যাপারে বিস্মিত বোধ করা সমীচীন নয়।

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদে ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রীর বিস্ময়, আনন্দ আর উত্তেজনার দৃশ্যটি অত্যন্ত সহজ সরলভাবে পেশ করেছেন। অস্বাভাবিক কোনো ঘটনার কথা শুনলে বা ঘটতে দেখলে একজন ব্যক্তির যে আচরণ করা স্বাভাবিক, ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী ঠিক অনুরূপ আচরণই করেছেন। ইবরাহীম (আ) আল্লাহ তায়ালার নির্বাচিত নবী। তিনি তার প্রিয় বান্দাহদের অন্যতম। তিনি আল্লাহ তায়ালার প্রিয় সুহৃদও বটে। কুরআন মজীদে তাকে খলিলুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন একজন নবীর স্ত্রী বিস্মিত, আনন্দিত, উত্তেজিত অবস্থায় কপাল বা মুখ চাপড়াতে চাপড়াতে সম্পূর্ণ অপরিচিত অতিথিদের সামনে উপস্থিত হলেন। অথচ এ ব্যাপারে কুরআন মজীদে নবী বা নবীর স্ত্রীর প্রতি কোনো ভর্ৎসনা নেই। বরং একজন মানুষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে উপরোক্ত ঘটনাটি কুরআন মজীদে বর্ণিত হয়েছে।" (পৃ ঃ ৩৬-৩৭)

লেখকের এ বক্তব্য প্রসঙ্গে প্রথম প্রশ্ন ঃ তিনি ইবরাহীম (আ)-কে ইসলামের প্রবর্তক বলেছেন তাহলে ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বের নবীগণ কি ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন না ? দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী আগন্তুক মেহমানদের কাছে মুখমণ্ডল খোলা রেখে এসেছিলেন এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার মত কথা তিনি কোথায় পেলেন। তার উদ্ধৃত আয়াতগুলোর মধ্যে তিনি কোথায় পেলেন ? তৃতীয়ত ঃ তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন যে, ইবরাহীম (আ) এবং তার স্ত্রী উভয়েই বৃদ্ধ। তাদের জন্য পর্দার আইন কি আদৌ প্রযোজ্য ? চতুর্থ প্রশ্ন ঃ ইবরাহীম (আ)-এর মেহমানগণ মানুষ ছিলেন না। ছিলেন ফেরেশতা। তারা ফেরেশতা পরিচয় দিয়েই সন্তানের শুভ সংবাদ দিয়েছেন এবং তার পরেই তিনি সামনে এসেছেন। মানুষ এবং ফেরেশতাদের সামনে যাবার ব্যাপারে একই নিয়ম কি প্রযোজ্য ? পঞ্চমত ঃ দ্বীন ও শরীয়তের পার্থক্য কি লেখকের কাছে আদৌ কোনো বিবেচ্য বিষয় নয় ?

লেখক এ প্রসঙ্গে সূরা কাসাস-এর তেইশ থেকে পঁচিশ আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে মূসা (আ) ও শোয়ায়েব (আ)-এর প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন সে প্রসঙ্গে আমাদের একই প্রশ্ন যে, এ বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক। শোয়ায়েব (আ)-এর সাথে মূসা (আ)-এর যখন কথা হয় তখনও মূসা (আ)-এর নবুওয়াতের ঘোষণা আসেনি এবং শোয়ায়েব (আ)-এর মেয়েরা কোন পোশাকে ছিল তারও কোনো উল্লেখ কুরআনে আসেনি। এছাড়া দ্বীন ও শরীয়তের যে পার্থক্য সে প্রশ্নটি এখানেও প্রযোজ্য।

সূরা মরিয়মের ১৬ থেকে ২২ এবং ২৭ থেকে ৩৩নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখক নিজের মন্তব্যে বলছেন অপর দিকে ঈসাকে গর্ভে ধারণ করার পর মরিয়ম (আ) লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যাওয়াটা চিরন্তন নারী প্রকৃতির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আবার আমরা দেখি নবজাত শিশু ঈসা (আ)-কে নিয়ে তিনি যখন লোকালয়ে ফিরে আসলেন তখন জনগণ তাকে দেখলে চিনতে পারল এবং শিশুর ব্যাপারে প্রশ্ন করলো। .....শিশুপুত্র কোলে নিয়ে জনগণের মুখোমুখি হওয়ার কারণে মরিয়ম (আ)-এর প্রতি কোনো ভর্ৎসনা কুরআন মজীদে দেখা যায় না।" (পৃষ্ঠা ৪৪)

এ উদ্ধৃতিটিও এখানে অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক। মরিয়ম (আ) লোকালয়ে কোন্ পোশাকে গিয়েছিলেন তার কোনো উল্লেখ এখানে নেই। আর চেনার জন্যে মুখ খোলাও কোনো জরুরী বিষয় নয়। এ প্রসঙ্গে লেখকের অপর উদ্ধৃতি সূরা বাকারার ২২১নং আয়াত। যার মূল বক্তব্য বিষয় মু'মিন পুরুষ মুশরিক নারীকে বিবাহ করবে না এবং মু'মিন নারী মুশরিক পুরুষকে বিবাহ করবে না। এখান থেকে লেখক আবিষ্কার করেছেন শুধু মুসলমান নারী-পুরুষই নয় বরং মুসলমান-অমুসলমান নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অবাধ মেলামেশা এবং একে অপরের রূপ সৌন্দর্য আকৃষ্ট হওয়ার প্রতি নাকি কুরআন অনুমোদন দিয়েছেন। লেখক বলছেন, "কিন্তু আল্লাহ তাআলা আয়াতটিতে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। একজন মুশরিক নারীর রূপ সৌন্দর্য একজন মু'মিন পুরুষের মনোহরণ করতে পারে। আবার একজন মুশরিক পুরুষকে দেখে একজন মু'মিন নারী মুগ্ধ হতেও পারে। .....কখনো কখনো একজনের রূপ সৌন্দর্য দেখে অপরজন মুগ্ধ হবে এতে অন্যায় কিছু আছে বলে কুরআন মজিদ আমাদেরকে কিছু জানাচ্ছে না। লেখকের এ উক্তিই প্রমাণ করে ইসলামের পর্দা প্রথার লক্ষ্য যে সামাজিক "পবিত্রতার সংরক্ষণ" তিনি এ ধ্যান-ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীতে অবস্থান করছেন। সূরায়ে হুজরাতে "পুরুষ পুরুষকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে না, নারীরা নারীকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে না" এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা নারী-পুরুষ ও নারীর

ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানের যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এ প্রসঙ্গে লেখক কি বলবেন ? আমার বলতে দ্বিধা নেই, এখানে এসে লেখক মুখমণ্ডল খোলা রাখার এবং নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগের পক্ষে যুক্তি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলেছেন। কুরআনের বিকৃত ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অন্য কোনো বিকৃতির শিকার হয়েছেন কিনা এ ব্যাপারেও প্রশ্নের অবকাশ আছে। এ রকম আরো অসংখ্য উদ্ধৃতি রয়েছে কিন্তু নিবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না। এ প্রসঙ্গে আলোচনা করাও রুচির পরিপন্থী।

সূরায়ে আহযাবের ৫৯নং আয়াতের আলোচনায়ও তিনি মনগড়া আলোচনার আশ্রয় নিয়েছেন। এখানে নবী পত্নী, কন্যা ও ঈমানদার নারীদের প্রতি তাদের উপর জিলবাব (বড় চাদর বা সমস্ত শরীর ঢাকার উপযুক্ত চাদর) লটকিয়ে দেয়ার অর্থ এবং এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলেছেন তা আল্লাহর নির্দেশনার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। 'জিলবাব' এ আরবী শব্দটি আরবী ভাষায় এমন একটা বড় কাপড়কে বুঝায় যা দিয়ে গোটা শরীরকে আবৃত করা যায়। এটা ব্যবহারের ব্যাপারে কুরআনে 'ইউদনিনা' শব্দ ব্যবহার করেছে যা উপর থেকে নীচে লটকিয়ে দেয়া বুঝায়। যার ন্যূনতম লক্ষ্য বলা হয়েছে তাদেরকে চেনা যাবে এবং তারা কোনো যন্ত্রণার মুখোমুখি হবে না। এখানে চেনা যাবার অর্থ লেখক ব্যক্তি পরিচয়ের দিকে নিয়ে এসেছেন যা একান্তই অবান্তর। এখানে চেনা বলতে ব্যক্তির পরিচয় নয় বরং শ্রেণী বা গোষ্ঠী বুঝানো হয়েছে। এ পোশাক যারা পরবে তারা পবিত্রতা অবলম্বনকারী। কিন্তু লেখক এখানে ব্যক্তি পরিচয়কে টেনে এনেছেন ? মুখ না দেখলে কিভাবে চেনা যাবে এবং ভালোমন্দ বুঝা যাবে এ প্রসঙ্গ এনেছেন যা একান্তই অবান্তর। চেহারা যেভাবে খতিয়ে দেখলে একজন মানুষ ভাল না মন্দ, সৎ না অসৎ বুঝা যায় সেভাবে দেখার অনুমতি তিনি কোথায় পেলেন ? এ আয়াতটিতে সরাসরি প্রথমত নবী পত্নী এবং তার কন্যাদের কথা এসেছে। উম্মাহাতুল মু'মিনীন বিশেষ করে হযরত আয়েশা (রা)-এ আয়াতের উপর কিভাবে আমল করেছেন লেখক সে প্রসঙ্গ আনেননি। রাসূল (সা)-এর বিশেষ দোয়ায় কুরআনের তাফসীরের বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এ আয়াতের অর্থ কিভাবে করেছেন ? এছাড়া সাহাবায়ে কেরাম তাবেঈন, তাবে তাবেঈন ও তৎপরবর্তী মুফাসসিরগণ এর অর্থ কিভাবে করেছেন সেটার উল্লেখ না করে নিজের পূর্ব প্রতিষ্ঠিত মতের পক্ষে কুরআনের আয়াতকে নিয়ে যাবার প্রবণতাও দুঃখজনক। অনুরূপভাবে সূরায়ে নূর-এর ৩১নং আয়াতের অংশবিশেষ "আর তারা যেন সাধারণত যা প্রকাশিত হয়ে পড়ে তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে" এর

ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাধারণত যা প্রকাশিত হয়ে পড়ে তা হচ্ছে "নারীর মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়" এটাও একপেশে মন্তব্য। এখানে কোনো কোনো মুফাসসির বা মুজতাহিদগণ মুখমণ্ডল খোলার পক্ষে মত দিলেও তিনটি শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। শর্ত তিনটি হলো ঃ (১) চেহারায় কোনো প্রসাধনী বা অলংকার থাকতে পারবে না। (২) ফেৎনার কোনো আশংকা থাকবে না। (৩) সুন্দরী হতে পারবে না। যদি বৃদ্ধা বা অসুন্দর হয় তাহলে চেহারা খোলা রাখতে পারবে। এখানে লেখক একতরফাভাবে মুখমণ্ডল খোলার Provision-কে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। যে কয়জন মুফাসসির মুখমণ্ডল প্রকাশের পক্ষে রায় দিয়েছেন তারা মূলতঃ সতর এবং হেজাবকে একাকার করে ফেলেছেন। সতর হলো মুহাররাম পুরুষের সামনে এবং নামাযের জন্য প্রযোজ্য আর পর্দা বা হেজাব হলো সতরের অতিরিক্ত পোশাক। যেমন সালওয়ার কামিজের এবং ওড়না অথবা শাড়ী দিয়ে সতর ঢাকা হয় হেজাবের জন্যে কিন্তু জিলবাব বা বড় চাদর (গোটা শরীর ঢাকার উপযোগী) বা অনুরূপ কাপড় অপরিহার্য। এ সম্পর্কে ইসলামের দাবী হলো কুরআন হাদীসের আভিধানিক, পারিভাষিক ও প্রায়োগিক অর্থসহ বিশেষজ্ঞদের সকল মতামত উপস্থাপন করে Merit যাচাইয়ের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দেয়া। সূরা নূরের উক্ত আয়াতের মূল লক্ষ নারীর সৌন্দর্যের প্রকাশ না করা। কিসের জন্যে ? যাতে কোনো অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির শিকার না হতে হয়। চেহারা যেহেতু মানুষের সৌন্দর্যের কেন্দ্রবিন্দু তাই প্রকাশ্য আয়াতে খোলা রাখার নির্দেশ পাওয়া না গেলে কৃত্রিম ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে মুখ খোলা রাখার পক্ষে ওকালতি করা বাঞ্ছনীয় নয়।

❐

উপসংহার

পর্দা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার সময় আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম কোন বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন নিয়ম প্রথা নয় ; বরং এটি একটি সম্পূর্ণ জীবন বিধান। এর যে কোন নিয়ম-পদ্ধতি থেকে উপকার পেতে হলে বা সঠিক ফল লাভ করতে হলে গোটা বিধানকেই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে পূর্ণরূপে। এক্ষেত্রে একজন মনীষীর দেয়া উদাহরণটা উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারলাম না। তিনি বলেছেন যে, একটি ঘড়ির কাজ হলো সময় বলা। যদি ঘড়ি থেকে সঠিক সময় পেতে হয় তবে তার যে অংশ যেখানে স্থাপন করা প্রয়োজন সেখানেই সেটা স্থাপন করতে হবে। কোন একটি অংশ ঘড়ি থেকে পৃথক করে সময় পেতে চাইলে সময় পাওয়া যাবে না। আবার গোটা ঘড়ি থেকে একটা দুইটা অংশ নিয়ে রাখলেও ঘড়ি সময় বলতে পারবে না। তেমনি ইসলাম রূপ জীবন বিধান থেকে সুফল লাভ করতে হলে পূর্ণ ইসলামকেই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আবার ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একথাও মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ পাক তাঁর রাসূল (সা)-কে গোটা কুরআন একবারে দিয়ে দেননি। দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে যখন যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু নাযিল করেছেন। এর মধ্যে আবার কিছু অংশ নাযিল হয়েছে মক্কায়—যার মধ্যে রয়েছে ব্যক্তি গঠনের উপযোগী নির্দেশাবলী। তওহীদ, রেসালাত, আখেরাত সম্পর্কে মানব মনে সঠিক ধারণা-বিশ্বাস জন্মানোর জন্যে প্রয়োজনীয় আয়াতসমূহ।

বাকী অংশ মদীনায় নাযিল হয়েছে—যেখানে রয়েছে ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের উপযোগী আয়াতসমূহ। পারিবারিক আইন, সামাজিক আইন, রাষ্ট্রীয় আইন, যুদ্ধ সন্ধির নিয়মনীতি এ পর্যায়ে এসেছে এবং সেগুলো মদীনার সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে জনগণ ইসলামের প্রকৃত শান্তির স্বাদ আস্বাদন করতে সক্ষম হয়েছেন। পর্দা এ রকমই একটি নির্দেশ যা মদীনার ইসলামী সমাজে নাযিল হয়েছে। মক্কী জীবনের চরম ঘাত-প্রতিঘাতে তৈরী রেসালাত, আখেরাতের শিক্ষায় সমৃদ্ধ একদল মানুষ যারা সঠিকভাবে আল্লাহর আইন অনুধাবন করতে বাস্তবিকই সক্ষম ছিল, তাদের কাছে যখন পর্দার নির্দেশ আসল তখন তাদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, এটি তাদের নৈতিক এবং তামাদ্দুনিক উন্নতির জন্যে অপরিহার্য প্রয়োজন। ইসলাম মানুষের জন্যে কোন ভারসাম্যহীন ও একদেশদর্শী আইন দেয়নি। এটি একদিকে যেমন নৈতিক পরিণাম পরিণতির দিকে লক্ষ রাখে ঠিক অন্যদিকে আবার মানবের প্রকৃত

প্রয়োজনকে সামনে রেখে বিচার করে এবং উভয়ের মধ্যে অতিমাত্রায় সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য বজায় রাখে।

পর্দা পালনের যে সমস্ত নির্দেশ রয়েছে এগুলো সম্পর্কে চিন্তা করলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ইসলামী পর্দা কোন গোঁড়ামীমূলক প্রথাও নয় আবার এটি নারীদের জন্যে অবরোধও নয় ; বরং এটি একটি জ্ঞান-বুদ্ধিসম্মত বিধান, যা মানব কল্যাণের জন্যে অপরিহার্য। জাহেলী প্রথা স্থবির ও অপরিবর্তনশীল। যে প্রথা যেভাবে প্রচলিত হয়েছে কোন অবস্থাতেই তার পরিবর্তন সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে বুদ্ধি-বিবেকসম্মত আইন নমনীয়। অবস্থা অনুযায়ী এর মধ্যে কঠোরতা, নমনীয়তার অবকাশ থাকে। অবস্থা অনুযায়ী এর নিয়ম-নীতির মধ্যে ব্যতিক্রমের পথও রাখা হয়। জ্ঞান-বুদ্ধি বিবেক দিয়ে এসব আইন-কানুনের বাস্তবতা উপলব্ধি করতে হয়। বিবেকসম্পন্ন মানুষ নিজেই সিদ্ধান্ত করতে পারে—কোন সময় সাধারণ আইন ও নিয়মনীতি পালন করা উচিত এবং কখন আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যতিক্রমের সুযোগ গ্রহণ করা যায়। এর জন্যে প্রয়োজন ব্যক্তির এমন প্রশিক্ষণ যা তাকে আল্লাহ তাআলা ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বানায়।

পর্দা প্রথা সহ যাবতীয় আইন যা কুরআন এবং সুন্নাহতে দেয়া হয়েছে, এগুলো মানব জীবনকে অচল বানিয়ে দেয়ার জন্যে প্রণয়ন করা হয়নি ; বরং মানবতার সুষ্ঠু বিকাশ এবং উৎকর্ষ সাধনের জন্যেই দেয়া হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এক শ্রেণীর লোকের অশিক্ষা-কুশিক্ষার ফলে এ বাস্তব বিধান বিকৃত হয়ে গেছে। পর্দা বলতে সমাজের সাধারণ ধারণা এই যে, নারীদের আপাদমস্তক আবৃত করে ঘরের কোণে বন্দী হয়ে থাকতে হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞান বা বুদ্ধি-বৃত্তির সাথে যাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। অথচ মানবতার চরম উৎকর্ষ সাধনের জন্য, নীতি-নৈতিকতার ধ্বংস ঠেকানোর জন্যে বিশ্বের রহমত হিসেবে যে আইনটি আসল, তার যথার্থতার উপলব্ধির চেষ্টা কেউ করছে না। পর্দা শুধু নারী জাতির জন্যে নয় ; বরং নারী-পুরুষের মিলিত সমাজে সবার জন্যেই এটা রহমত স্বরূপ। এ বিধান বাস্তবায়িত ততক্ষণ পর্যন্ত হতে পারে না, হওয়া সম্ভবও নয়—যতক্ষণ না রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়। পর্দা ইসলামী রাষ্ট্রেরই একটি বিধান, যত দিন মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি, ততদিন পর্যন্ত পর্দার আইন, মদ ও সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার আইন জারী হয়নি।

একটি জাতির মন-মগজে আল্লাহর আইনের বাস্তবতা উপলব্ধির যোগ্যতা সৃষ্টি হওয়ার আগে সে আইন মেনে চলা আদৌ সম্ভব নয়। সম্ভব নয় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আইন প্রণয়ন করেও। জেল, যুলুম, জরিমানা করে আইন

মানানো যায় না ; বরং এর জন্যে প্রয়োজন হয় নৈতিক প্রশিক্ষণ। যে প্রশিক্ষণ মক্কী জীবনের দীর্ঘ তের বছর আল্লাহ মুসলমানদেরকে দিয়েছেন। তওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের শিক্ষায় শিক্ষিত এ জাতি যখন মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে তুলল তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা আইন বাস্তবায়নে তাদের বেগ পেতে হয়নি। পক্ষান্তরে দুনিয়ার সবচেয়ে উন্নত রাষ্ট্রগুলোতে আমরা দেখতে পাই আইন করে নিষিদ্ধ করে দেয়ার পর সেখানে সীমালংঘন এবং আইন অমান্য করাকে রোধ করতে না পেরে সে আইন তাদেরকে তুলে নিতে হয়। আমেরিকায় বিশের দশকে মদ নিরোধক আইন এর প্রমাণ।

কাজেই সব শেষে আমি একথা বলতে চাই, পর্দা ইসলামী সমাজেরই আইন। এটি বাস্তবায়িত করতে হলে রাসূলে করীম (সা)-এর অনুকরণে পূর্ণ ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে। এর জন্য নারী-পুরুষ নির্বিশেষে চালাতে হবে চূড়ান্ত প্রচেষ্টা। যার নির্দেশ কুরআনে এবং সুন্নাহতে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল দিয়েছেন। যে প্রচেষ্টার নাম কুরআনের ভাষায় "জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ"। যা সবচেয়ে বড় ফরয। এ কাজ ছাড়া পর্দার উপকারিতা কিছুতেই লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই যদি সমাজ থেকে বেপর্দা, নোংরামী, অশ্লীলতা দূর করে একটা কুলুষমুক্ত আদর্শ সমাজ কায়েম করতে চাই তাহলে আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে ইসলামী সমাজ গড়ার বজ্র শপথ নিয়ে। বেপর্দা, বেহায়াপনা দেখে আজ অনেকেই দারুণ মর্মপীড়ায় ভুগছেন। অনেকে এর রোধকল্পে স্থানীয়ভাবে পদক্ষেপেও নিচ্ছেন। কিন্তু এ বেপর্দা রোধ করার একটাই পথ, যে পথে চলেছেন আমাদের নেতা একমাত্র আদর্শ রাসূল করীম (সা)। এছাড়া বিকল্প আর কোন পথ নেই। পূর্ণ ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে সব সমস্যা আপনা থেকেই দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

কিন্তু আমরা এখন যারা অনৈসলামিক সমাজে বাস করছি তাদের ইসলামী সমাজ গড়ার আন্দোলনের কাজের পাশাপাশি ব্যক্তি জীবন ও সামাজিক জীবনেও পর্দা পালন করতে হবে। উপরে আমরা আলোচনা করেছি যে, ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হওয়ার পরেই ইসলামী আইন-কানুনের সফল প্রয়োগ সম্ভব এবং সর্বস্তরের জন্যে মানুষের পক্ষে তা অনুসরণ করা সহজসাধ্য। এর অর্থ এটা করা ঠিক হবে না যে, ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ কায়েম হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এটা মানার প্রয়োজন নেই ; বরং এ ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা তখনই কায়েম করা সম্ভব হবে যখন এ অনৈসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে একদল নিবেদিত প্রাণ নারী ও

পুরুষ স্বতস্ফূর্তভাবে নিজস্ব প্রচেষ্টায় ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ইসলামী নীতি নৈতিকতা ও অনুশাসন মেনে চলার বাস্তব দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে সক্ষম হবে। যেমন মক্কার জাহেলী সমাজের পাপ পংকিলময় পরিবেশের মধ্যে ১৩ বছরের সাধনায় রাসূলে করীম (সা) যে লোক তৈরী করেছিলেন তারা ছিলেন ঐ সমাজের ব্যতিক্রমধর্মী লোক। পাপ-পঙ্কিলতার গড্ডালিকা প্রবাহে তারা গা ভাসিয়ে দেননি। জাহেলী পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতার ছোঁয়া থেকে তাদের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, এমনকি সামাজিক পরিবেশও ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত। এমনকি তাদের অর্থনৈতিক জীবনও ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। জাহেলী যুগের ঐ সমাজে তাদের এ ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্রের সাক্ষ্য দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ।

আল্লাহ বলেন ঃ

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ
الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ○ وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ○
وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ق اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَمًا ○
اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ○ وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ
يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ○ وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ
وَلَايَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ج وَمَنْ
يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ○ يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ
مُهَانًا ○ اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ
سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ
صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ○ وَالَّذِيْنَ لَايَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ لا وَاِذَا
مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ○ وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا
عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا ○ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا
وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ○ اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ

بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا ○ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ○

"রহমানের (আসল) বান্দাহ তারা, যারা যমীনের বুকে নম্রতার সাথে চলাফেরা করে। আর জাহেল লোকেরা তাদের সাথে কথা বলতে আসলে বলে দেয় যে, তোমাদের সালাম। যারা নিজেদের রব এর হুজুরে সিজদা করে ও দাঁড়িয়ে থেকে রাত অতিবাহিত করে। যারা দোয়া করে এই বলে ঃ হে আমাদের রব, জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদের বাঁচাও। উহার আযাব তো বড়ই প্রাণান্তকরভাবে লেগে থাকে। বিশ্রামস্থল ও বাসস্থান রূপে তা তো বড়ই জঘন্য। যারা না বেহুদা খরচ করে, না কার্পণ্য করে ; বরং দুই সীমার মাঝখানে মধ্যম নীতির উপর দাঁড়িয়ে থাকে। যারা আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদকে ডাকে না, আল্লাহর হারাম করা কোন প্রাণকে অকারণে ধ্বংস করে না। ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না। এ কাজ যারা করে তারা নিজেদের গোনাহের প্রতিফল পাবে। কেয়ামতের দিন তাদেরকে পৌনঃপুনিক আযাব দেয়া হবে এবং তাতেই তারা লাঞ্ছনা সহকারে পড়ে থাকবে। এটি থেকে বাঁচবে তারা যারা (এসব গোনাহ করার পর) তওবা করেছে এবং ঈমান এনে নেক আমল করতে শুরু করেছে। এ লোকদের দোষ-ত্রুটি ও অন্যায়কে আল্লাহ তাআলা ভাল দিয়ে বদলিয়ে দেবেন। আর তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, দয়াবান। যে ব্যক্তি তওবা করে নেক আমলের নীতি গ্রহণ করে সে তো আল্লাহর দিকে ফিরে আসে যেমন ফিরে আসা উচিত। আর রহমানের বান্দাহ তারা, যারা মিথ্যা সাক্ষী হয় না আর কোন অর্থহীন বিষয়ের নিকট দিয়ে অতিক্রম করতে হলে তারা শরীফ মানুষের মতই অতিক্রম করে। যাদেরকে তাদের রবের আয়াত শুনিয়ে নসীহত করা হলে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে পড়ে থাকে না। যারা দোআ করতে থাকে এ বলে যে, হে আমাদের রব, আমাদের স্ত্রীদের ও আমাদের সন্তানদের দ্বারা আমাদের চক্ষুসমূহকে শীতলতা দাও এবং আমাদেরকে পরহেযগার লোকদের ইমাম বানাও। এরাই হচ্ছে সেই লোক যারা নিজেদের সবর–এর ফল উচ্চতম মঞ্জিলরূপে পাবে। সাদর সম্ভাষণ ও শুভ সম্বোধন সহকারে তাদের সম্বর্ধনা হবে। তারা সবসময় সেখানে থাকবে। কতই না উত্তম সেই বিশ্রামস্থল, কতই না উত্তম সেই বাসস্থান।" (সূরা ফুরকান ঃ ৬৩-৭৬)

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ هُمْ
عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ هُمْ
لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ اِلاَّ عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ
غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ○ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۚ وَالَّذِيْنَ
هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ○
اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۙ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ط هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

"নিশ্চিত কল্যাণ লাভ করেছে ঈমানগ্রহণকারী লোকেরা, যারা নিজেদের নামাযে ভীতি ও বিনয় অবলম্বন করে, যারা বেহুদা কাজ থেকে দূরে থাকে, যারা যাকাতের পন্থায় তৎপর হয়, যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। নিজেদের স্ত্রী ছাড়া এবং সেই মেয়েলোকদের ছাড়া, যারা দক্ষিণ হাতের মালিকানাধীন আছে (এই ক্ষেত্রে হেফাযত না করা হলে তারা ভর্ৎসনার যোগ্য নয়)। অবশ্য এদের ছাড়া অন্য কিছু চাইলে তারাই সীমালংঘকারী হবে, যারা নিজেদের আমানত ও তাদের ওয়াদা-চুক্তির রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং নিজেদের নামাযসমূহের পূর্ণ হেফাযত করে। এ লোকেরাই সেই উত্তরাধিকারী যারা উত্তরাধিকারী হিসেবে পাবে ফেরদাউস এবং সেখানে থাকবে চিরদিন।"

–(সূরা মু'মিনুন ঃ ১-১১)

সমাপ্ত

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- **পর্দা ও ইসলাম**
  সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- **স্বামী স্ত্রীর অধিকার**
  সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- **মুসলিম নারীর নিকট ইসলামের দাবী**
  সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- **মুসলিম মা বোনদের ভাবনার বিষয়**
  অধ্যাপক গোলাম আযম
- **মহিলা সাহাবী**
  তালিবুল হাশেমী
- **সংগ্রামী নারী**
  মুহম্মদ নূরুয্যামান
- **ইসলাম ও নারী**
  মুহাম্মদ কুতুব
- **ইসলামী সমাজে নারী**
  জালালুদ্দিন আনসার উমরী
- **আল কুরআনে নারী (১-২)**
  অধ্যাপক মোশাররফ হোসাইন
- **একাধিক বিবাহ**
  সাইয়েদ হামেদ আলী
- **নারী নির্যাতনের কারণ ও প্রতিকার**
  শামসুন্নাহার নিজামী
- **নারী মুক্তি আন্দোলন**
  শামসুন্নাহার নিজামী
- **আদর্শ সমাজ গঠনে নারী**
  শামসুন্নাহার নিজামী
- **পর্দা কি প্রগতির অন্তরায়?**
  সাইয়েদা পারভীন রেজভী
- **পর্দা প্রগতির সোপান**
  অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম
- **বাংলাদেশে নারী মুক্তি আন্দোলনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া**
  মোঃ আবুল হোসেন বি.এ